পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

জয়া মিত্রের আত্মজীবনী : ‘হন্যমান’

কবি সাহিত্যিক পরিবেশ কর্মী জয়া মিত্রের *‘হন্যমান’* বইটিতে লেখিকার জীবনের একটা খণ্ডিত পর্বের কথাই উঠে এসেছে। ৭০-এর দশকে নকশালপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুণ লেখিকাকে ১৯৭০-১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেলে কাটাতে হয়েছিল। মূলত এই জেলজীবন পর্বের স্মৃতি নির্ভর আত্মকথন *‘হন্যমান’* বইটি। নিজের জেল জীবন পর্বের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা নিজের কথা কমই বলেছেন, বেশী করে স্থান পেয়েছে আশপাশে থাকা সাধারণ জেলবাসীদের জীবনের কথা। তবে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর কারাবাসকালীন আত্মকথার বিশেষত্বই হল এরা প্রত্যেকেই সাধারণ জেলবাসীদের কথা বেশি করে বলতে চেয়েছেন। বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, কৃষ্ণা হাতি সিং থেকে আরম্ভ করে রাণী চন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহিলা রাজনৈতিক বন্দির আত্মকথায় এই বিশেষত্ব আছে। তুলনায় যতজন পুরুষ রাজনৈতিক কর্মী কারাবাস করেছেন তাদের কারাবাসকালীন আত্মকথায় নিজেদের কথাই বেশি উঠে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ আজিজুল হকের *‘কারাগারে আঠারো বছর’* বইটির কথা বলা যায়।

‘হন্যমান’ বইটিকে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী গ্রন্থ বলা যায় কি না এই নিয়ে দ্বিধা আছে। তবে নিজের জেল জীবন পর্বের যে পরিচয় লেখিকা *‘হন্যমান’* বইটিতে দিয়েছেন তা কিন্তু বিবরণধর্মী নয়। বিশেষ জীবন দর্শনের আলোকেই লেখিকা জীবনের এই পর্বের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। যে কোন আত্মজৈবনিক গ্রন্থেই জীবনের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক বিবরণ কাম্য নয়, সেখানে আত্মজীবনীকারের

অন্তঃবিশ্লেষণই কাম্য। *'হন্যমান'* এই আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ হয়। বুঝে নেওয়া যায় বিশ শতকের এক বাঙালি নারীর চিন্তা চেতনার পরিসরের জায়গাটিকে। তাই *'হন্যমান'* বইটিকে কেবলমাত্র একটি স্মৃতি গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করলে বইটির সাথে যেন অবিচার করা হয়। *'হন্যমান'* বইটি একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী না হলেও অবশ্যই খণ্ডিত আত্মজীবনীর গোত্রভুক্ত।

আত্মজীবনী হলো আত্মবিনির্মাণ। নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজেরই অজ্ঞাত পূর্ব পরিসরের পুনর্নির্মাণ। সেক্ষেত্রে জীবনের বিশেষ কোন পর্বের কথাই তাঁরা লেখেন যা তাঁদের প্রভাবিত করেছিল বা স্মরণে আছে বা লিখতে চান। আর বিশ্ব সাহিত্যে এরকম অনেক আত্মজীবনীই রয়েছে যা আত্মজীবনীকারের জীবনের খণ্ডিত কোন পর্বকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'স্বরচিত আত্মচরিত'* অথবা মনোদা দেবীর *'একজন গৃহবধূর ডায়েরি'*র কথাই ধরা যায়। যেখানে দেবেন্দ্রনাথ নিজের ১৮ বৎসর বয়স কাল থেকে ৪১ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত জীবন কাহিনী উনচল্লিশটি পরিচ্ছদে লিখেছেন আর মনোদা লিখেছেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ এর মধ্যেকার শৈশবের অভিজ্ঞতা। কোন আত্মজৈবনিক গ্রন্থে আত্মজীবনীকারের জীবনের খণ্ডিত কোন পর্ব উঠে এলেও সমাজ বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে তার গুরুত্বকে ছোট করা যায় না। কারণ জীবনের সেই খণ্ডিত পর্ব নির্দিষ্ট কোন সময় ও সমকালের পারিপার্শ্বিকতা সহ আত্মজীবনীকারের জীবন অভিঘাতের পাঠকে তুলে ধরে যা সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *'হন্যমান'* বইটিও নির্দিষ্ট এক সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতিতে লেখিকার জীবন অভিঘাতের পর্যায়কে তুলে ধরে সমাজ বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠে পরিণত হয়েছে। এখানে আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই, *'হন্যমান'* বইটির দে'জ সংস্করণ (ষষ্ঠ)-এ প্রকাশক বইটির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন– *"HANYAMAN a Bengali Novel by Jaya Mitra"*–একটা আত্মজৈবনিক গ্রন্থকে আমরা যদি Novel বা উপন্যাস

হিসাবে গ্রহণ করি তবে তার মর্যাদাকেই যেন ক্ষুণ্ণ করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতেও গ্রন্থের গুরুত্ব বিনষ্ট হয়। কারণ Novel বা উপন্যাস ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি জীবন আশ্রিত হলেও ঔপন্যাসিককে তার শৈল্পিক গুণ বজায় রাখবার জন্য কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়। নির্মাণ করতে হয় চরিত্রের। এমনকি পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও ফলে তার মধ্যে কৃত্রিমতা এসেই যায়। আত্মজীবনী সাহিত্যে এই কৃত্তিমতার স্থান নেই। জীবনের বাস্তবতা এখানে কৃত্রিমতার মোড়কে পরিবেশিত হয়না। তাই সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মজীবনী সাহিত্য অন্য যে কোন সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব আদায় করে। *'হন্যমান'* বইটির লেখিকার কথা অংশ পড়লেই বোঝা যায় বইটি লেখিকার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। কাল্পনিক নয়। প্রকাশকের দ্বারা বইটির পরিচয় দান *'Novel'* বা *'উপন্যাস'* বিষয়ে লেখিকার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাইলে তিনি জানান এই বিষয়ে তার মতামত নেওয়া হয়নি। তাই বলবো বইটির পরিচয় দান প্রসঙ্গে প্রকাশকের হয়তো আরেকটু যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল।

নকশাল আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে কারাবাসী লেখিকা জয়া মিত্র কারা প্রাচীরের আড়ালে আবদ্ধ জীবনগুলোর হতাশা লাঞ্ছনা বিভৎসতাকে প্রত্যক্ষ করে জীবন উপলব্ধির এই পাঠকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন *'হন্যমান'*-এর মধ্য দিয়ে। বইটি লেখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লেখিকা সেই গুরুত্বের কথাই শোনান–

"এরকমই তো হয় যে, ঢেউ ওঠে কিংবা পড়ে। বিপুল বন্যা আসে ও সরে যায়, বিশেষ পরিবর্তন হয়না মূলস্রোতের ধারায়। এ রকম হওয়াকেই আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই এবং বন্যায় রিলিফ পাঠানো হল জেনেই নিশ্চিন্ত হই। জেল সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভয়, অপরিচয়কে সত্তর দশক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ব্যাপক সাধারণ মানুষের মন থেকে। সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়েছিল সেই বিপুল ভাঙচুর আর জন–জোয়ারের দশক।

তার পরদিন বদলালে, শ্মশান ও পুনরায় ঘাসজমি হয়ে ওঠা শান্তি ফিরে

এলে, যারা কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের অনেকে লিখলেন জীবনের সেই অন্ধকার-অংশের কথা—অত্যাচার, পাশবিকতা হত্যা ও নির্মম বিভৎসার সেই-সব স্মৃতি।

কিন্তু কী হল তাদের যারা তার আগেও ছিল জেল-প্রাচীরের ভিতরে আর পরেও রয়েছে?

যারা সচেতনে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ডাক দিয়েছিল ক্ষমতা দখল করার, তারা তো অত্যাচার, বন্দীত্ব, মৃত্যুবরণ করেছিল জেনে বুঝে। তাদের আশ্রয় ছিল দেশের উদ্বেল হৃদয়ে। কিন্তু যারা এসব কিছুই নয়, যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনো রকম টিকে থাকতে চেয়ে কিংবা থাকতে না পেরে কোনও অপরাধ করেছে, সামাজিক স্বাস্থের পোকা বাছাই করে 'সংশোধনের জন্য' যাদের রাখা হয় জেলে - কী ভাবে থাকে সেই মানুষেরা?

অনেক সময় অনেকে বলেছেন 'কী হল জীবনের এতগুলো বছর নষ্ট করে?' আমি জানি না 'নষ্ট' শব্দের মানে। আমি বুঝি যদি এই বছর ক'টা জীবন থেকে বাদ যেত আমার। নরকের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষের সাহস তার ভালোবাসা- যেখান থেকে, এমন কি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও, অপ্রতিরোধ উঠে আসছে জীবন। আর সেই জীবন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত মানুষের চেতনার দিকে, আশপাশে বাস করা মানুষজনের উদাসীন নিশ্চিন্ততার দিকে। রেখে আসা সেইসব মুখগুলির কাছে, এখন যাঁরা তাদের জায়গা নিয়েছেন- তাঁদেরও কাছে আমার এক দায়বদ্ধতা ছিল।

এ-বই আমার একার রচনা নয় বলেই মনে করি। যা আছে আমি শুধু তাই দেখতে চেয়েছি, যদি এইসব আরও অনেক সাথীরা এগিয়ে আসেন আর বইটির শেষ অধ্যায় সকলে মিলে রচনা করা যায়!

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝবেন শেষ পৃষ্ঠায় লেখাটি শেষ হয়নি, এক বহমানতাকে

ছেদ করা হয়েছে মাত্র।"[১]

কারাগার সভ্য সমাজেরই দান অথচ সভ্য সমাজের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকা জীবনগুলো। সেই অন্তরালেরই গল্পের সঙ্গে কারাপ্রাচীরের বাইরের সমাজও উঠে এসেছে বইটিতে সাধারণ জেলবাসীদের কথা বলার পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটও ধরা পড়ে যায় বইটিতে। সব মিলিয়ে এক বৃহৎতর সমাজ পরিবেশের কথাই উঠে এসেছে *'হন্যমান'* বইটিতে।

'হন্যমান'-বইটিতে জয়া মিত্র নিজের ব্যক্তি পরিচয়কে একেবারেই প্রাধান্য দেন নি তথাপি লেখিকার জীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক পরিচয় জানা প্রয়োজন। জয়া মিত্রের জন্ম ১৯৫০ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিহারের ধানবাদ শহরে। ধানবাদে জন্মালেও জয়া মিত্রের শৈশব কেটেছে উত্তরপ্রদেশের বেনারস শহরে। বাবা-সুরেন্দ্রনাথ সেন ও মা সাধনা সেন। বাবা ছিলেন ডাক্তার, তবে ডাক্তারি তিনি করেন নি। অরুণাচল প্রদেশে তিনি মিলেটারি এ্যাডমিনিস্ট্রারের কাজে যুক্ত ছিলেন। জয়ার পিতৃবংশের আদি নিবাস অবিভক্ত বাংলার খুলনায় হলেও বেশ কয়েক পুরুষ ধরে তাদের বাস ছিল উত্তর প্রদেশে। উত্তর প্রদেশের সুপোলে ঠাকুরদাদার জমিদারি ছিল। সাক্ষাৎকারে জয়া মিত্র নিজের পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশের কথা জানান। ছোটবেলায় তিনি ঠাকুমাকে দেখতেন মহাভারত পড়তে। মায়েরও বই পড়ার নেশা ছিল। বাবার অবর্তমানে মাকেই পরিবারে নেতৃত্ব দিতে হত। তাদের পরিবারে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না থাকা, পরিবারের সদস্যদের ছাড়াও আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে আশ্রয়লাভের কথা জয়া মিত্র জানিয়েছেন। মা সাধনা সেনের মেয়েদের পড়াশুনোয় আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- *"মা বলতেন ছেলেরা তবু হাওড়া স্টেশনে কুলিগিরি করতে পারে মেয়েদের হাতে দুটো কাগজ কলম না হলে চলেনা।"*[২]

জয়া মিত্রের শিক্ষা জীবনের সূচনা বেনারস শহরেই। প্রথমে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হলেও পরে হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পুনরায় ক্লাস ফোরে ভর্তি হন। সেখানেও কয়েক মাস পড়ার পর তিনি কার্সিয়াঙের ডাও হিল স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছিলেন। কার্সিয়াঙে তিন বৎসর পড়াশুনোর পর কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ভর্তি হন ক্লাস টেনে। এখান থেকেই তৎকালীন উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর বর্ধমানের এন. ইউ. সি উইমেন্স কলেজে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন এরপর রাজনীতিতে প্রবেশের কারণে এম. এ. পড়া আর হয়নি। জয়া মিত্রের রাজনীতিতে প্রবেশের দিনগুলির পরিচয় *'হন্যমান'* প্রকাশের পরবর্তীকালে পুলকেশ মণ্ডলের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত *'সেই দশক'* (১৯৯৪) বই এর *'চলতে চলতে'* শিরনাম রচনায় পাওয়া যায়। *'চলতে চলতে'*-তে তিনি ১৯৬৪ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের এর মত ঘটনা বৃত্তিগুলি যে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তা জানান। পরিবারে রাজনীতির সক্রিয়তার পরিবেশ না থাকলেও এইসময় কাল থেকেই ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতির দিকে ঝুকতে থাকেন। সরোজ আচার্যের *'নৈরাজ্যবাদ'*, এমিল বার্ণাসের *'মার্ক্সবাদের অ আ ক খ'*, স্তালিনের *'ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম'* দেবী প্রসাদ আচার্যের *'লোকায়ত দর্শন'* বইগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে জয়া মিত্রের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব চলতে থাকে।[৩] কলেজ জীবনে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দান। সে সময় ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান প্রসঙ্গে নিজের উৎসাহের কথা জানাতে *'চলতে চলতে'*-তে লিখেছেন *"আর আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য—আমাদের খুব কাছাকাছি আছে কমিউনিস্ট পার্টি। আমি যে শহরে কলেজে পড়ি সেই ইউনিভার্সিটিতেই নাকি আছে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন-স্টুডেন্ট ফেডারেশন।*

এ কথা জেনে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছি একেবারে। কি করে

যোগাযোগ করব তাদের সঙ্গে? বহু কষ্টে জোগার করলাম ইউনিয়নের সেক্রেটারির নাম। সেকেন্ড ইয়ারের মেয়েটি চিঠি লিখল সেই অচেনা ছেলের উদ্দেশ্যে 'আমি সিনেমা হলের উল্টো দিকের ফুটপাথে রিক্সা থেকে নামব, কাঁধ ঝোলানো ব্যাগ থাকবে। অপেক্ষা করবেন। আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে।'[৪] – খাদ্য আন্দোলন পরবর্তীসময়ে জয়ার ছাত্র ফেডারেশনে প্রবেশের উৎসাহের চিত্র কিন্তু তৎকালীন বাঙালি যুব সমাজের সামগ্রিক চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির কাছে নকশাল বাড়ি থানা অঞ্চলের কৃষক হত্যার ঘটনা যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল জয়া তার শরিক হলেন। এর আগে কল্যাণ রায়ের 'আর. সি. সি. আই' (রেভোলিউশনারি কমিউনিস্ট কোর অব ইন্ডিয়া)-এর গোপন গ্রুপে সদস্য হন। জয়া পার্টির *'কর্মি'* নামে কাগজ সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে বার্ণপুর থেকে 'কর্মি'র একটি সংখ্যা বের হয়।

এই সময় জয়া মিত্রের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনেও পরিবর্তন আসে। তিনি বিয়ে করেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাকে। জয়া মিত্রের বিবাহিতা জীবনে সৃষ্টি হয় সমস্যা। ১৯৬৮ সালে কন্যা সন্তান জন্মানোর পর জয়া মিত্র পুরুলিয়া শহরের গার্লস স্কুলে চাকুরি নেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এই পর্ব থেকে জয়া ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হতে শুরু করেন। পুরুলিয়া শহর সংলগ্ন বিড়ি শ্রমিকদের মাঝে যাতায়াত, গ্রামের কৃষকদের মাঝে যাতায়াত এই সময়ই তিনি করতে থাকেন। ১৯৭০ সালে জয়া ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। তাঁর জেল জীবনপর্বের সূচনা হয়।

'চলতে চলতে' আত্মকথনমূলক রচনাটিতে লেখিকা জয়া মিত্র সত্তরের দশক সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় দিয়েছেন নিজের রাজনৈতিক কর্মী জীবনের। একজন রাজনৈতিক কর্মী

হিসাবে ঘরে-বাইরে ঘটে চলা ঘটনা বৃত্তির প্রেক্ষিতে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের খোলামেলা বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে *'চলতে চলতে'* লেখাটিতে।

'হন্যমান' জয়া মিত্রের জেল জীবন পর্বের আত্মকথা। স্মৃতির পটে একে একে তিনি জীবনের এই পর্বের ঘটনা বৃত্তিকে সাজিয়েছেন তবে স্মৃতির এই পরম্পরা সব জায়গায় ঠিক থাকেনি ওলটপালট হয়েছে। জেল মুক্তির ১৫ বৎসর পর (লেখিকার জেলমুক্তি ঘটে ১৯৭৪ সালে। *'হন্যমান'* বইটির প্রকাশ ১৯৮৯ সালে) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের ব্যবধানে জীবনের ঘটনা বৃত্তির স্মৃতি ওলটপালট হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তবে পুরোটাই তাঁর জেল জীবনের স্মৃতিকথা নয় ঘটনার প্রেক্ষিতে কখনো পূর্ব জীবনের স্মৃতিতে মসগুল হয়েছেন লেখিকা। মানুষের মনতো বাধন ছাড়া হয়, আর লেখিকাও তার মনের বাঁধনের মুক্তি ঘটিয়েছেন বইটিতে।

'হন্যমান' শুরু হয় লেখিকার জেল প্রবেশের ঘটনাকে স্মরণের মধ্যদিয়ে। থানায় পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে কোর্টে হাজিরার পর অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর মেদিনিপুর সেন্ট্রাল জেলে যাত্রা। জয়া মিত্র লিখেছেন—

"সকালবেলা কোর্টে নিয়ে যাবার সময় থানায় একজন অফিসার বলেছিলেন, মনে রাখবেন- থানায় কিন্তু আমরা আপনার সাথে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করিনি। গাড়ির পাশটায় থু থু ফেলেছিলাম তাতে তখনও রক্তের ছোপ ছিল।"[৫] সত্তরের দশকে নকশালপন্থী আন্দোলনের গতিরোধে রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর যে ব্যাপক দমন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল-এই সকল চিত্র তার সাক্ষ্য বহন করে। একদিকে শারীরিক নির্যাতন তার সাথে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা সরকারি এই দমন প্রক্রিয়ায় কেবল লেখিকাই শিকার হননি সমকালীন সময়ে আরও অনেক যুবক যুবতিরা হয়েছিলেন, তাদের অনেকের পরিচয় রয়েছে *'হন্যমানে'*। আর এই সরকারি দমন প্রক্রিয়া যে মাত্রা ছাড়িয়ে হত্যালীলাতেও পৌঁছাত *'হন্যমান'* বইটি তার কথাও বলে। বহরমপুর জেলে ২৪ ফেব্রুয়ারি

১৯৭১ সালে খুন করা হয় মোট সাত জন নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীকে। যাদের মধ্যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র তিমির সিংহ, সতেরো বছরের বালক গোরা ছিল।"[৬] অত্যন্ত গোপনে বিনাকারণে বিনাপ্ররোচনায় এই হত্যালীলা চালানো হয়েছিল। বন্দুকের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয় সাতজনকে। লেখিকার কথায়–

''চব্বিশে ফেব্রুয়ারি জেল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে বিনা প্ররোচনায় এই হত্যা করেছে। গুলির শব্দ পাছে বাইরে জানাজানি হয়, তাই বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাদের। তার মধ্যে সতের বছরের বালক গোরা ছিল। যে খুন হয়, তার নিরুপায় দাদার চোখের সামনে।"[৭]

এই হত্যালীলার বিভৎসতা প্রসঙ্গে তিমির সিংহের মা বলেছেন- *"বহরমপুর জেলে পুলিশের গুলি চালনার খবর যেদিন কাগজে বেরোলো, প্রথমে ওর নাম বেরোয়নি। কিন্তু আমার মনে হল আমার ছেলে তো কখনোই পেছনে পড়ে থাকেনি, এ ব্যপারেও হয়তো থাকবে না। গেলাম বহরমপুরে। অনেক চেষ্টায় তিমিরের খোঁজ পাওয়া গেল। বীভৎসভাবে মারা হয়েছিল ওকে। চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছিল। এমনিভাবে মারলে জানবে কি আর সেদিন ওকে যেতে দিতাম।''*[৮]

বোঝা যায় কিরূপ বিভৎস অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তৎকালীন নকশাল আন্দোলনকারী যুবক-যুবতীরা। সমকালীন সময়ে আন্দোলনে জড়িত না থেকেও শুধুমাত্র তারুণ্যের বা কৈশোরের অপরাধেও অন্যায়ভাবে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। জয়া মিত্র পাপু নামে একজন মেয়ের কথা বলেছেন যে আন্দোলনে জড়িত ছিলনা, তার অপরাধ সে অল্পবয়সী। পাপুকেও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পুলিশের গুহা থেকে *'থেঁতো হয়ে যাওয়া'* মাংসপিণ্ডের মত তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জেলারের হাতে। তিনি মৃতদেহ ভেবে প্রথমে তাকে নিতে চান নি। জয়া মিত্রের কথায়–

“পাপু বলে একজন এসেছিল, যে নিজে জেনে বুঝে আসেনি। হয়ত তার কাছ থেকে কোনও খবর চেয়েছিল পুলিশ কিংবা সেই সময়ের যে অন্যতম অপরাধ তারই সে শরিক ছিল কম বয়সী হওয়া। কসবা থানা থেকে আসা আধমরা পাপুর কথা এজন্য এল যে কোন কিছুর সঙ্গে পাপুর যোগ ছিলনা। যেসব খোঁজ ওর কাছে চাওয়া হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে না- যে অভিযোগ ওর সম্পর্কে করা হচ্ছিল তার সঙ্গেও না- এমনকি তেমন কোন মতাদর্শের সঙ্গেও নয়। আর তারই জন্যই যে কোন সাধারণ ছোট মেয়ের মতো পাপু ভয় পেয়ে ছিল। আমরা তখনও নিচে যাই স্নান করতে। যেদিন খবর এল পরদিন পাপুকে আবার নিয়ে যাবে পি সি তে- পুলিশের গুহায়, গরাদের ভিতর দিয়ে হাত ধরে ওর অসহায় শুকনো মুখ, সে মুখ তখনও ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ, ঠোঁট কাটা- দ্যাখো আমার জ্বর হয়েছে। জ্বর হলেও কি পি সি-তে নিয়ে যায় গো? আর এমন তো নয় যে ওর বদলে অন্য কেউ যেতে পারে। তাই গরাদের এপারে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আর পনেরো দিন পর সেই ভয় পাওয়া নরম মেয়েটি ফেরত আসে থেঁতো হয়ে যাওয়া একটা মৃত প্রায় শরীর হয়ে, যাকে জেলার নিতে চাননি মৃত দেহ ভেবে।”[৯] সমকালীন সময়ে পুলিশি নির্যাতনের এই পরিধি রাজনৈতিক কর্মীদের অভিভাবক পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল। লেখিকা নকশাল কর্মী ঝুমার বাবার কথা বলেছেন। ঝুমাকে পুলিশ না পেয়ে তাঁর বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল পরে বাড়িতে পাঠিয়েছিল বাবার মৃতদেহ। জয়া মিত্রের কথায়–

“ঝুমা ধরা পড়ার সপ্তাহখানেক আগে, মেয়েকে না পেয়ে সপ্তমীর দিন ঝুমার শান্তস্বভাব বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল খাকিরা। একাদশীর দিন মৃত দেহ ফেরত দিয়ে গিয়েছে।”[১০]

নকশালপন্থী আন্দোলনের গতিরোধ করতে সরকার ব্যাপক দমননীতি গ্রহণ করলেও ১৯৬৯-৭১ ছিল এই আন্দোলনের চরমতম পর্যায়। যদিও আন্দোলনের প্রস্তুতি বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ’৭২ এর মাঝামাঝি থেকে

আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে তখন জেলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী। জয়া মিত্রের জেলে আসার ঘটনা ১৯৭০-এ। প্রথম দিন মেদিনীপুর জেলে প্রবেশের সময় তিনি অর্ভথিত হন প্রচণ্ড স্লোগানের মাঝে- *"এতক্ষণে দেখি যেখান দিয়ে এলাম, সেখানে দূরে উঁচুতে একটা কালো বোর্ডের গায়ে সাদা রঙে লেখা* **Midnapore central Jail** *আবার একটা বিরাট দরজা, তার গায়ে একটা কাটা দরজা, তালা খোলার শব্দ হয়, এতক্ষণে সত্যিকার জেলের ভেতর ঢুকি। আর কেঁপে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে যাই। প্রচণ্ড শ্লোগানের শব্দে প্রত্যুষের আকাশ থর্ থর্ করতে থাকে। কাছে দূরে লাল রঙের ব্লকগুলোর জানলার গরাদ ধরে কারা দাঁড়ানো! এত!"*[১১]

'প্রচণ্ড শ্লোগানের শব্দে প্রত্যুষের আকাশ থর্থর্ করতে থাকে।' প্রতীকী এই বাক্যেই সমকালীন সময়ের নকশালপন্থী আন্দালনের তীব্রতার সংকেত পাওয়া যায়। এই দিক থেকে বলা যায় *'হন্যমান'* বইটি বাঙালি মেয়েদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার একটা পর্বকে উত্থাপন করে।

'হন্যমান'-এ সমকালীন নকশাল আন্দোলনের আরও বেশ কিছু প্রসঙ্গ এসেছে। এ আন্দোলনে জয়া মিত্রের মত শহুরে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের অংশ গ্রহণ যেমন ঘটেছিল তেমনি তাদের আশ্রয় দিতে, পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে সাধারণ গ্রামগঞ্জের মানুষেরা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে ছিল, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। *'হন্যমানে'* জয়া মিত্র এরকমই একটা স্মৃতির কথা বলেছেন। কিভাবে বিড়ি শ্রমিক বস্তিতে তিনি আশ্রয় লাভ করেছিলেন। বিড়ি শ্রমিকবস্তির ছেলে দিলীপ নিজের জীবন বিপন্ন করেও তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে–

"মায়াকে দেখলে অনেক সময় দিলীপের কথা মনে হয়। এরকম বর্ষায় আরও বেশি। কি ভালোবাসা পেয়েছি ওর কাছে।

সত্তর সালের বর্ষাকালে একটা অদ্ভূত সপ্তাহ এসেছিল। জুলাই মাসের

সমস্তটা সপ্তাহ ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ল। ডাক্তার বলেছিলেন প্লাস্টার করা তো সম্ভব নয়। কোন শক্ত চৌকির ওপর অন্তত ছ'সপ্তাহ একেবারে সটান শুয়ে থাকলে পিঠের হাড়ের চোটটা সারতে পারে খানিক। ফলে শহরের প্রান্তে একটা বাড়িতে ব্যবস্থা হয়েছে শুয়ে থাকা। সে বাড়িতে কেউ বাস করে না সেভাবে। সারাদিন বিড়ি শ্রমিকরা সামনের দিকে দুটো ঘরে বসে বিড়ি বাঁধেন। রাত্রে তাঁরাই কয়েকজন পেছনের একটা ঘরে ঘুমোন। বড় ছড়ানো বাড়ির অসমাপ্ত কাঠামো। কাদা দিয়ে গাঁথনি করা ইটের দেওয়াল, চারপাশে উঁচু পাঁচিল। সামনের মুখে একটা গলি। কিন্তু পিছনে বিশাল মাঠ, কনক ধুতরো আর পুটুশের জঙ্গল। সেদিকে মাঠে মাঠে কয়েক মাইল হাঁটলে একেবারে অন্য অঞ্চলে গিয়ে ওঠা যায়। সেদিনটা রবিবার। দুপুরবেলা দিলীপ আর অন্য একজন এসেছে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করতে আর খানিকটা সাবধানতার জন্যও। বেলা তিনটে নাগাদ পাড়ার একটি ছোট মেয়ে সে লোকের বাড়ি বাসন মাজে, ব্যস্তভাবে বলে গেল গলির মুখে বড় রাস্তায় পুলিশের বড় গাড়ি আর জিপ দাঁড়িয়েছে। তাকে খবর দিয়ে যেতে বলেছে বড়রা। পাঁচিলের একটা জায়গায় মাথা সমান উঁচুর পর ভাঙা, সেটা আগেই দেখা ছিল। নিমেষেই ঠিক হল দিলীপ আর আমি পাঁচিল পার করে চলে গিয়েছি দেখে অন্য কমরেডটি পাড়ায় ঢুকে পড়বে। ভাঙা জায়গাটার পাশে একটা ছোটমত কুল গাছ আছে দেখেছিলাম কিন্তু খেয়াল করিনি। এখন চুল আর শাড়ি সেই কাঁটায় জড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে দেওয়াল না ধরে ওঠা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে কাঁদার গাঁথনি গলে গেছে। প্রথম যে ইটটা ধরে পাঁচিলে উঠতে গেলাম সেটা আমার হাতে খুলে এল। সময় পালিয়ে যাচ্ছে। দিলীপকে চেনে না পুলিশ। ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া খুব জরুরি।

দিদি, ইট পড়ুক, তুমি উইঠে পড়।

তাই করেছিলাম। হাতের ইটটা খসেও গেছিল কিন্তু পিঠে পড়েনি। আমরা যখন সমস্ত মাঠ ডোবা জলের মধ্যে দুটো কনক ধুতরোর লাঠি বাড়িয়ে

পুকুর-ডোবা ঠাহর করতে করতে খানিকদূরে গিয়েছি তখনও পেছনে কোন কোলাহল শুনিনি।

চোখে পড়ল দিলীপের জীর্ণ শার্টের পিটের মাঝখানে রক্ত ফুটে উঠেছে। দিদি ভাঙা শিরদাঁড়ায় আবার ছোট লাগলে যদি উঠতে না পারে তাই পাখির মায়ের মত পিঠের ওপর নিজের শরীর আড়াল করে ইটটা নিয়েছে। ওর বাবা বিড়ি-শ্রমিক। যে খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না, যে জিনিস রেখে আসবার কাজ করে দেবার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না- দিলীপ একপায়ে খাড়া। এমনি বর্ষার রাত্রে অন্ধকারে মিটিং করে অন্ধকারেই বস্তিতে ফিরছি। গলির মোড় থেকে সাথীরা ফিরে যাচ্ছেন। কুচকুচে অন্ধকারের মধ্যে কার একটা হাত! একেবারে চমকে উঠছি কী রে! খুব ফিসফিস করে, দিদি আমি-দিলীপ। আর তার সঙ্গে ভারি নরম গলায়- দিদি আমি কতদিন তোমাকে চোখে দেখিনাই! তারপর তো দেখলাম থানার খটখটে আলোর নিচে। মাঝরাতে তুলে এনেছে পুলিশ। গভীর ঘুম থেকে টেনে তুলেই আচমকা মেরেছে, তখনও সদ্য ঘুমভাঙা, কেমন একটা বিস্ময় জড়িয়ে আছে চোখে। যে একটা চোখ খোলা আছে, সেটায়। অন্যটা কপালের রক্তে আর ফোলায় বুঝে গিয়েছে।''[১২]

জয়া মিত্রের এই একান্ত ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা নকশালপন্থী আন্দোলনে সাধারণের ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার কথা বলে যায়। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় নকশালপন্থী আন্দোলন সমকালে বিচ্ছিন্ন কিছু শহুরে শিক্ষিত যুবক-যুবতীর আবেগতাড়িত আন্দোলন ছিলনা এই আন্দোলন একটা গণবিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। জয়া মিত্রের *'চলতে চলতে'* লেখাটিতে আমরা এই আন্দোলনে সাধারণের অংশ গ্রহণের আরও পরিচয় পেয়ে যাই। *'চলতে চলতে'* লেখাটিতে জয়া মিত্র পুরুলিয়ার জি.এস.এস. বিড়িবস্তির শ্রমিকদের পার্টির 'দেশব্রতী' পত্রিকা পড়া নিয়ে উৎসাহের কথা জানিয়েছেন–

"জি.এস.এস. বিড়ি বস্তির এলাকা বিরাট। সেখানে যখন পুরোপুরি বাস করতে চলে এসেছি তার আগে থেকে কয়েকজনের যাতাযাতের মধ্য দিয়ে এখানে প্রথমে পার্টির বেশ কিছু রাজনৈতিক সমর্থকদের একটি দল ও তার মধ্যে থেকে ফলের মাঝখানে বীজের মতো ছোট একটি পার্টি ইউনিট গড়ে উঠেছে। জুতো তৈরির কারিগর কালোদা তার নেতা। বিড়ি কারখানায় যখন শ্রমিকরা কাজ করতেন সবাইকে বসতে হতো একসঙ্গে। কেউই কথা বিশেষ বলতেন না। প্রথম দিকে সন্ধের পর বস্তিতে গিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতাম শ্রম ও সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে, শ্রমিকদের ইজ্জত সম্পর্কে, তখন যাঁরা খুব মন দিয়ে শুনতেন তাঁরাই নিজেদের কারখানার সাথিদের কাছে প্রথমে ধীরে ধীরে আলোচনা শুরু করেন। তাঁদের কথামতো আমরা এক-দু'জন বিড়ি কারখানায় যেতে থাকলাম। শ্রমিকদের জটলার মাঝখানে তাদেরই মতো মাথা ঝুঁকিয়ে মেঝেতে বসতাম। বাইরে থেকে চট করে বোঝা যেত না। এখানে বসে খুব নিচু গলায় দেশব্রতী পড়া হতো। এই কাগজের খবর শোনার ব্যাপারে শ্রমিকরা খুবই আগ্রহী ছিলেন।"[১৩] সেখানেই নকশালপন্থী আন্দোলন ঘিরে গ্রাম্য সাধারণ মানুষদের সহযোগিতার- উৎসাহ- উদ্দীপনার আরও অনেক কাহিনী লিখেছেন। আবার একই বইয়ে প্রকাশিত *'সেই দশকের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ'* লেখাটিতে মায়া চট্টোপাধ্যায় ও নকশালপন্থী আন্দোলনে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষদের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। মায়া চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–

"অনেক কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই আসল কথাটাই জানানো হচ্ছে না-কত হাজার হাজার প্রাণ, তখনকার প্রশাসনের হাতে কি নির্মম, নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। কত হাজার হাজার ছেলে গ্রামেগঞ্জে পুলিশের নিযুক্ত শিকারী কুকুর গোয়েন্দাদের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। গ্রামেগঞ্জের সাধারণ অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে পুরুষের দল সেইসব ছেলেদের সন্তানস্নেহে নিজেদের অভুক্ত রেখে তাদের খাইয়েছে রাতের পর রাত জেগে তাদের পাহাড়া দিয়েছে, নিজেদের সংসার

বিপন্ন করেও স্নেহে শ্রদ্ধায় তাদের জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে।''[১৯]

'হন্যমান' বইটি ঘটমানকালের আবহে গ্রথিত। এই ঘটমানকাল একান্তই লেখিকার জেলজীবন। কেবল এক-দুই জায়গাতেই লেখিকা অতীতচারি হয়েছেন নতুবা বইটি একেবারেই জেলপ্রাচীরের আবদ্ধ জীবনের আত্মকথন। আত্মকথন হলেও লেখিকা নিজের কথা কম বলেন, বলে যান আশেপাশে থাকা সাধারণ জেলবাসীদের কথা। আর এই সাধারণের কথা বলেন একেবারে সাধারণ হয়েই। একজন রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে তিনি জেলে ডিভিশন নেবার সুযোগ পেয়েও তিনি তা নেন না। নিজের জেলজীবন কাটান একেবারেই সাধারণ জেলবাসীদের মাঝে থেকে। লেখিকার *'চলতে চলতে'*– লেখাটিতে দেখা যায় লেখিকা জেলে আসার পূর্ব জীবনে পার্টির কাজ করতে কখনো বিড়ি বস্তিতে কখনো গ্রামগঞ্জের সাধারণের সঙ্গে কাটিয়েছেন। জেলে প্রবেশের পর লেখিকা যেন সেই জীবনের অভ্যাসকেই বজায় রাখতে চেয়েছেন। এর কয়েকটি উদাহরণ এরকম–

১। *"গঙ্গার মা দেখা করতে এসে দিয়ে যেত অনেক উপদেশ, নিজের চোখের জল আর ভায়ের গাছের লেবু। আঃ কি টাটকা গন্ধ! জেলে না গেলে কখনো কি জানা যেত মুসুর ডালের জল, শাড়ির আঁচল দিয়ে পোকা ছেঁকে ফেলে, লেবুর রস দিয়ে খেতে কি যে ভালো লাগে! তার সাথে যে দিন খাঁদি বউদি সিকি ইঞ্চি পুরু দুখানা রুটি গুড়ো করে নুন আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মাখে–''* [১৫]

২। *"হাসপাতালে বরদা মেট বিমলা ভাবী ছাড়াও প্রায় দশজন মেয়ে থাকে। বাকি সবাই দুপুরে বিশ্রামের সময়টুকু বন্ধ দরজার সামনে বসে অবাধে গল্প করে। বারো জনের ভাত একটা থালায় একসঙ্গে মাখি। শান্তা ওর বহুদিনের জমিয়ে রাখা একটু সর্ষের তেল নিয়ে আসে। শ্রেষ্ঠ মায়োনীজের চেয়েও অনেক সুস্বাদ সেই তেল দিয়ে ভাত মেখে জেলের ঘরের মধ্যে দারুণ আনন্দে পিকনিক হয়। ওরা সবাই জেলে এসেছে আমারও অনেক আগে, সুতরাং মাত্র দু'বছরের পুরনো*

বাইরের গল্প তো তখনও টাটকাই শুনতে শুনতে, একে একে সবাই ঘুরে আসে নিজেদের কত রকম স্মৃতির মধ্য দিয়ে। আড়াই ঘণ্টার দুপুরের প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা নিংড়ে নিই, আস্বাদ করি?'' [১৬]

এর বাইরে কখনো জেলের সাধারণ বন্দি জায়াদাদির সঙ্গে 'কাকা-ভাইপো' সম্পর্ক পাতেন। [১৭] পাগল যামিনীর চলৎ শক্তিহীন মেয়ে পুষ্পের 'মা'য়ে পরিণত হন। [১৮] সাধারণ জেলবাসীদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষমতা জয়া মিত্রকে এদের অনেক কাছাকাছি আসবার সুযোগ করে দিয়েছিল অনুমান করা যায়। জয়া মিত্র তাঁর জেলজীবনের স্মৃতিচারনায় একে একে সাধারণ জেলবাসীদের জীবনের কথা শোনান গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে, উঠে আসে বেশ কিছু সামাজিক প্রশ্ন। একজন নারী হিসাবেই হয়তো জেল প্রাচীরে আবদ্ধ একেকজন মেয়ের জীবনের পারিবারিক সামাজিক লাঞ্ছনার, নিষ্ঠুরতার কাহিনীগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়।

জয়া মিত্র মেদিনীপুর জেলে আসা মাদ্রাজি মেয়ে জয়লক্ষ্মীর কথা বলে যান সহজ, সাবলীলভাবে। সে ছিল কোন দীনহীন পুরোহিত ঘরের মেয়ে। যাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল কলাই কুণ্ডা এয়ার বেসের কোন নিম্নতন শ্রেণীর কর্মী। জয়া লেখেন– *"সেখানে বিনা যৌতুকে আসা বৌয়ের নিত্যদিন লাঞ্ছনার পুরনো ইতিহাস। পুরনো ইতিহাস একটি সন্তান জননের, ক্লান্তির, তিক্ততার। জয়লক্ষ্মীর ইতিহাসে নতুন যেটুকু, তা হলো ওকে বাড়িতে রেখে, তীর্থভ্রমণের নামে শাশুড়ির এবং আট মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে ব্যাগে কিছু জামাকাপড় ধোপাবাড়ি দিয়ে আসার নামে স্বামীর, অন্তর্ধান। শূন্যবাড়ির উদ্বেগ-আশংকা-প্রতীক্ষা আগলে তিন দিন বসে থাকা, চতুর্থদিন রাস্তায় নেমে কলাইকুণ্ডা যাবার পথের খোঁজ করতে করতে ধর্ষিত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা। অবশেষে পুলিশের হেফাজত, মেদিনীপুর জেল।''* [১৯]

জয়লক্ষ্মীর মত কোন মেয়ের শ্বশুর ঘরে যৌতুকের জন্য নির্যাতিত হওয়ার

মত ঘটনা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত। খুঁজলে হয়তো আমাদের নিজেদের পরিবার পরিচিতের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে এরকম মেয়ে যারা শ্বশুরবাড়িতে যৌথুক বা বিবাহপণের জন্য নির্যাতিত হন। জয়লক্ষ্মীর গল্পটা আরেকটু বেশি নিষ্ঠুর কারণ তাঁকে স্বামী শ্বাশুড়ি পরিত্যাগ করে যায় এমনকি আট মাসের সন্তানকে পর্যন্ত মায়ের কোলছাড়া করা হয়। এর সাথে যুক্ত হয় জয়লক্ষ্মীর ধর্ষিতা হবার ঘটনা। জয়া মিত্র জয়লক্ষ্মীর মত মেয়ের জীবনের নিষ্ঠুরতম কাহিনী *'হন্যমান'* বইটিতে স্থান দিয়ে সমাজের বিভৎস রূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেতে চান। একে এক প্রকার সমাজের সর্বস্তরের নারীর সম্মান, অধিকার রক্ষার্থে লড়াই হিসাবেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। জয়া মিত্রের জন্মের দেড়শত বছর আগে জন্মানো রাসসুন্দরী ও *'আমার জীবন'* বইটিতে লেখনির মধ্য দিয়েই সমাজে নারীর অধিকার, সম্মান রক্ষার্থে লড়াই শুরু করেছিলেন দেড়শত বছর পরেও বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের আরেক বাঙালি নারী সেই লড়াইকেই বজায় রাখতে বাধ্য হন। এর মধ্য দিয়ে এই দিকটাই স্পষ্ট হয় যে, আমাদের সমাজ নারীকে তার কাঙ্ক্ষিত অধিকার সম্মান দিতে অক্ষম। বইগুলোতে নাম-চরিত্র-পেক্ষাপট আর সময় বদলেছে মাত্র। জয়লক্ষ্মীর জীবনের গল্পের মধ্য দিয়ে জয়া নারীর ওপর সামাজিক লাঞ্ছনার বিভৎসতাকে আরও বেশী করে আলোকিত করেন যখন তিনি লেখেন- *"ওর বয়স ওকে তিক্ততা ও দুঃখ ভোলায়, খেলায়, হাসায়। তারপর কখনো রাত্রে ঘুমের মধ্যে ফোঁপায়। সন্ধেবেলা হঠাৎ বসে বসে দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়ে, ওরা আমার মেয়েটাকে কেন নিয়ে গেল? ওর জানো পেটের অসুখ করে ছিল।"*[২০]

জয়ার মিত্র লেখনির মধ্য দিয়ে সামাজিক বিভৎষসতার বিরুদ্ধে একজন মায়ের আর্তনাদ আমাদের অন্তঃস্থলে চরমতম আঘাত হানে। আবার এই আবহ প্রতীকী হয়ে ওঠে যখন জয়া জয়লক্ষ্মী ও মেদিনীপুর জেলের গঙ্গার বন্ধুত্বের কথা শোনান– ''গঙ্গার সঙ্গে জয়লক্ষ্মীর বন্ধুত্বটা দেখবার মত। দুজনে পরস্পরের

ভাষার একবর্ণও বোঝে না। অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা উঠোনের মাঝখানে পা মেলে বসে কিংবা রাত্রে ওয়ার্ডের একপাশে কম্বলের ওপর শুয়ে শুয়ে গঙ্গা গ্রাম্য মেদিনীপুরের ভাষায় আর জয়লক্ষ্মী ওর সেই ইংরেজি-হিন্দি-মাদ্রাজির অপরূপ মিশ্রণে গল্প করে যায়। খুব অসুবিধে হচ্ছে এমনও মনে হয় না।"[২১]

জয়লক্ষ্মী ও গঙ্গা দু'জনে ভিন্ন ভাষী ভিন্ন দু'টি সমাজ থেকে উঠে আসা দুই নারী কিন্তু হৃদ্যতা তাদের কাছে টেনে নেয়। ভাষাও যেখানে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না এই সম্পর্ক আসলে নারীত্বের। নারীত্বের বন্ধনেই আত্মীয় পরিজন সমাজের কাছে লাঞ্ছনার শিকার জয়লক্ষ্মীর কাছে ভিন্ন ভাষী গঙ্গা অনেক বেশী আপন হয়ে ওঠে।

জয়া মিত্র নারীর প্রতি লাঞ্ছনার বিষয়ে কতটা সচেতন বোঝা যায় যখন তিনি মেদিনীপুর জেলের গঙ্গার কথা বলেন। গঙ্গার জেলে আসার কারণ বলতে গিয়ে লেখিকা জানান- *"কোন রাজনৈতিক পার্টির কর্মীকে নিজের ঘরে থাকবার জয়গা দিয়েছিল গঙ্গা। পাশের থানার এক সুদখোরকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে এসেছে।"*[২২] এই গঙ্গা সম্পর্কে পরের গল্প লেখিকা এভাবে বলেছেন- *"গঙ্গা গিয়েছিল অফিসে। ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জেলার। টিপ পরে, খোঁপায় কাঁটা গুঁজে গিয়েছিল। ফিরে এল সমস্ত মুখ ফেটে পড়ছে। ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকে আছড়ে পড়ে কান্না। কী হয়েছে? ওর স্বামী অত্যন্ত নীচ স্বভাবের লোক। বিয়ের পরপরেই গঙ্গা আবিষ্কার করে নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে সংসর্গিত লোকটি। একই ঘরে তাদের দু'জনের সঙ্গে রাত কাটাতে হয় গঙ্গাকে কতদিন। সে অপমানের প্রতিবাদ করা যে ওর অধিকার জানত না। স্বামীকে মেনে নিতে হয় এই তো জেনেছে পিঠময় কঞ্চির দাগ নিয়ে। ভাগ্নীই একমাত্র নয়। নারী মাংস সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সাতবছর জেল হয়েছে লোকটির। সেই স্বামীকে জেলার দায়িত্ব দিয়েছেন, গঙ্গাকে সঠিক পথ বাতলাবার। স্বামীত্বে স্বীকৃত অধিকারে, এক অফিস অপরিচিত পুরুষের মধ্যে গঙ্গাকে সে*

নোংরা ভাষায় লাঞ্ছনা করেছে। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে উড়নচণ্ডী ভগবানে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মেশার জন্য। সমাজে মুখ পুড়িয়ে জেলে আসার অপরাধে গঙ্গাকে সে যে ফিরে গিয়েও ঘরে নেবে না, সে কথা জানিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত জোরের সঙ্গে। জেলারকে ডেকে পাঠালে তিনি আসেন না। বিকেলবেলা দরজার বাইরে থেকে আমাকে অসুস্থ শরীরে উত্তেজিত না হবার উপদেশ ও বইপত্র পাঠিয়ে দিয়ে, পড়াশুনা নিয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়ে দ্রুত চলে যান। ডেবরা থানা থেকে আসা চালের চোরা চালানকারিণী বয়স্কা আদিবাসী মাসি সন্ধেবেলা বসে, গঙ্গার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওর স্বামীকে, জেলারকে মাতৃস্নন্যে প্রতিপালিত সমস্ত পুরুষ জাতকে প্রাণ খুলে গালি দেয়।''[২৩] – গঙ্গার প্রতি লেখিকার সহমর্মিতা চোখে পড়ার মত। গঙ্গার মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের প্রান্তিক এক নিপীড়িত মেয়েরই পরিচয় পাই যে দীর্ঘদিন ঘরে দুশ্চরিত্র স্বামীর নিপীড়ন সহ্য করে আসে 'সে অপমানের প্রতিবাদ করা যে ওর অধিকার জানতনা' বলে। গঙ্গার গল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজে পুরুষের দ্বিচারিতা ফুটে ওঠে। গঙ্গার স্বামী নিজে দুশ্চরিত্র নারী মাংস সম্পর্কিত মামলার অপরাধি। সে গঙ্গাকে সঠিক দিশা দেখাতে চায়।' আর এই ব্যবস্থা করে দেন জেল কর্তৃপক্ষ। এখানে বিনোদিনী দাসীর আক্ষেপের কথা মনে পড়ে যায়। নিজের 'কলঙ্কিনী' হওয়া প্রসঙ্গে বিনোদিনী বলেছিলেন- *"বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিনী ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? ... অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চিরকলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আহুত তাঁহাদের মধ্যে কেহ নন কি?.... ঐ অবলা প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন। .... শত দোষ করিয়ে ক্ষতি নাই– কিন্তু নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।''*[২৪]

বিনোদিনী সমাজে যেভাবে পুরুষের দ্বিচারিতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন

লেখিকাও তদ্রূপ-স্বামী, জেল কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঙ্গার লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার মধ্যে পুরুষের দ্বিচারিতার রূপেই আবিষ্কার করেছেন। পুরুষের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে লেখিকা যেমন সোচ্চার হন জেল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চান। আবার তার লেখায় উঠে আসে শশী বিবির কথা– ''রোগা শুকনো চেহারা শশী বিবির বয়স হবে গোটা পয়তাল্লিশ। জমি নিয়ে কাজিয়ায় ছেলে- স্বামীর সঙ্গে সেও অভিযুক্ত হয়ে এসেছে। ওর সম্পর্কে শুকনো বিশেষণটাই বোধ হয় সবচেয়ে আগে মনে আসে। তীব্র ফর্সা মেচে তার দাগ ভরা মুখ, খর কণ্ঠ, বিশ্ব পৃথিবীর সবকিছুর ওপর কুঁচকে থাকা একজোড়া চোখ, অশালীন কর্কশ জিভ। সেই শশী বিবিকে দেখি স্ট্যাম্পের কালির মত রঙের শাড়ির আঁচল মাথার ওপর দিয়ে গলা পর্যন্ত টেকে, ওয়ার্ডারের পেছন পেছন অফিসের দিকে যাচ্ছে। ওর মামলার ডেট পড়েছে। শুধোই,

– শশী বিবি আতো বড়ো ঘোমটা দিয়েছে কেন?

– আওরাতকে হায়া লজ্জা রাখতে হয় দিদি। ওর মুখের ভাষায় লজ্জা ও লজ্জা পায়, ইস্তক ওয়াডাররাও।

– অতোবড়ো ঘোমটার ভেতর থেকে কিছু দেখতে পাবে না যে গো।

– আল্লাতাল্লার নিয়ম দিদি, আবরু না রাখলে দোজখ্ হবে।'' [২৫]

ধর্মের বিধি নিষেধে আবদ্ধ শশী বিবির মত মেয়েরা আজও আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে। লেখিকা ধর্মের আবদ্ধতার বাইরে এক উন্মুক্ত নারী জীবনকেই আকাঙ্ক্ষা করেছেন। শশীবিবিকে নিয়ে আক্ষেপে সেই সুরই বেজে ওঠে- *"আর আল্লাতাল্লার তৈরি এই এতো বড়ো দুনিয়াটাকে ভালো করে জীজান ভরে দেখে নেবার কোন নিয়ম নেই শশী বিবি? কে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর রক্তের মধ্যে এইসব নিয়ম, যা ওকে তৃষিত হতে পর্যন্ত বারণ করে দেয়। মনো রঞ্জন ছাড়া অন্য কোন সৌন্দর্য কি শালীনতার অর্থ নেই ওর পৃথিবীতে।''*[২৬]

'হন্যমান' বইটিতে বারেবারেই একেক জন অত্যাচারিত নিপীড়িত মেয়ের গল্প উঠে আসে। একজন নারী হিসাবেই হয়ত নির্যাতিতদের মুখপাত্র হিসাবে তাদের গল্প বলে লেখিকা সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন চেয়েছেন। এক জায়গায় নিজের পূর্ব রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে লেখিকা কমলা নামে এক ছোট মেয়ের কথা বলেছেন। যাকে অবশ্য লেখিকা নিজে চোখে দেখেন নি। এই কমলার পরিচয় পেয়েছিলেন নিজের কোন রাজনৈতিক সাথীর কাছ থেকে। সেই রাজনৈতিক সাথীটি কমলা নামে মেয়েটিকে পার্টির আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। প্রথমাবস্থায় লেখিকা যে সেই প্রস্তাবটি ভালোভাবে নেননি অকপটে স্বীকার করেছেন। জয়া মিত্রের কথায়–

"প্রথমেই রেগে গেলাম। কোনও কিছু না শুনেই বকলাম খুব। রোমান্টিকতা করার ইচ্ছা থাকলে পাড়া ছেড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসবার কী দরকার ছিল! কাজের জায়গায় এইসব সস্তা রোমান্স, তারপরে আবার সে মেয়েকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা–! এটা কোনও পিকনিক পার্টি নয়, সে কথা মনে রাখতে হবে।''[২৭] এইভাবে নিজের আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা বইটির মাধুর্য বাড়িয়ে দেয়। প্রথমাবস্থায় এই মেয়েটি সম্পর্কে সচেতন না হলেও পরে তার বেদনার কথা শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন আর তাই হয়তো নিজের জেলজীবনের স্মৃতির মাঝে তার কথা স্মরণ করেছেন। লেখিকার কথায়– *"এই মেয়েটির মায়ের মরণাপন্ন অসুখের সময় এর বাবা গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে গোটা কতক পায়রা চেয়েছিল বৌকে পুষ্টিকর পথ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবে ভেবে। মহাজন অবলীলায়, উদারভাবে দশটা কবুতর নিয়ে যাবার অনুমতি দেয় তাকে। বৌ অবশ্য বাঁচেনি পায়রার মাংস খেয়েও। দশ বছর পর যখন মেয়েটির বয়স চৌদ্দ-পনেরো, তখন মহাজন হঠাৎ চাষীকে ডেকে পাঠিয়ে দশ বছর আগে নেওয়া কবুতরের দাম শোধ করে দিতে বলে। তার মধ্যে সেই দশটি পাখির দশ বছরে বর্ধিত বংশক্রমের হিসাব ধরা ছিল। এটা গল্প কথা নয়, এই পোড়া জোলায়*

বহু জমিখণ্ড পায়রাচালি, পায়রাজোত, ভুজাভাঙা এইসব নামে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী আছে। সেই কয়েকশত পায়রার মহাজন নির্ধারিত দাম দেওয়া চাষীর সাধ্য ছিল না। থাকবে না সে কথা মহাজনও জানত। অকারণ দশ বছর পর হঠাৎ পায়রার দাম চায়নি সে। যে দাম চাষীর ঘরে আছে, তা-ই চাইল মহাজন বেগার খাটতে যেন পাঠিয়ে দেয় চাষীর মেয়েকে। পনেরো বছর বয়সের সাধ্য যতরকম খাটনি হতে পারে সবকিছুই বেগারে খাটবার জন্য মা-মরা, যত্নে বড় করা মেয়েকে মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরে বেঁচেছিল বিনা জমিতে আজন্ম চাষ করে আসা সেই চাষী। ভাগ্য মেনে নিয়ে দুবেলা দু'মুঠো উদয়াস্তেরও বেশি। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নিজেকে ক্ষয় করে যাওয়ার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল মেয়েটি। আজ প্রায় দু'বছর ধরে। আমাদের সাথীটি ওখানে গ্রামের ভূমিহীন অতি দরিদ্র চাষীদের মধ্যে একটু একটু করে নিজের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তার মুখে প্রতিরোধের কথা শুনে, বাঁচবার গল্প শুনে, মহাজনের বাগাল মানে রাখাল এই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছে, এই মেয়েটিকে কি তারা বাঁচাতে পারে? এখনই?

ভিতরটা কেঁপে গিয়েছিল।

বস্তির বিড়ি শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলাম। তাদের বাড়ির মেয়েরা বললেন, এটা কি শুধোবার কথা! যদি আমাদের একবেলা একমুঠো জোটে তারও জুটবে। এতগুলো মানুষের মধ্যে একটা পেট কি বাড়তি হয়?

সাথীটি ফিরে গেল।

তারপর প্রায় মাস দুই-তিন আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। আমি নিজের অঞ্চলে আছি, শহরে এসে অন্যদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে ফিরে গিয়েছে। এইটুকু শুনেছি আশপাশের গ্রামেও যাওয়া-আসা করছে সে।

প্রায় মাস তিনেক পর দেখা হতে তাকে জিজ্ঞাস করলাম সেই মেয়েটির

কথা, যাকে নিয়ে আসবার কথা ছিল। বস্তির লোকেরাও ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়েছেন তার।

চুপ করে রইল খানিক। তারপর শুনলাম। বাগালটির সঙ্গে তাকে কথা বলতে দু-একদিন দেখেছেন মহাজনগৃহিনী। তারপর কী যে হয়েছিল বাড়ির ভিতর, কেউ জানে না। গোয়ালের আড়া থেকে ঝুলছিল মেয়েটির গলায় দড়ি বাঁধা শীর্ণ দুঃখী দেহটি।''[২৮] কমলার এই যন্ত্রনাদগ্ধ কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সত্যের পরিচয়। এখানে লেখিকা যে মহাজনের অত্যাচারের কথা বলেছেন তার নাম বা কোনস্থানের স্পষ্ট করেন নি। লেখিকা নিজের রাজনৈতিক জীবনে পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে কাজ করেছিলেন। এই মহাজন হয়তো পুরুলিয়ার কোন গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিই হবেন। পায়রা ধারে দিয়ে মহাজন যেভাবে কমলার বাবাকে ঋণের জালে ফাসিয়ে ছিলেন সে কাহিনীটি সত্যিই নৃশংস। এই মহাজনের শোষণের কাহিনী ৭০এর দশক বা তার পাশপাশের সময়ে বাংলার গ্রামীন অঞ্চলের ঋণব্যবস্থার কদর্য রূপের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নকশালপন্থী আন্দোলন চলাকালীন বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে বেশ কিছু মহাজন, সুদখোর ব্যবসায়ী হত্যার শিকার হয়েছিলেন এর পেছনে হয়তো এইরূপ শোষণের ক্ষোভগুলি দায়ি ছিল। কমলার এ কাহিনী থেকে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে নকশাল কর্মীদের সামাজিক কর্মে আত্মনিয়োগের দিকটি যেমন স্পষ্ট হয়। তেমনি নকশালপন্থী আন্দোলনে সাধারণের অংশ গ্রহণকে আবারো প্রমাণিত করে। জয়া বিড়ি শ্রমিকদের বস্তিতে কমলাকে রাখার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন এবং এতে বিড়িবস্তির মানুষদের উৎসাহের দিকটি বেশ চোখে পড়ে– *“বস্তির বিড়ি শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলাম। তাদের বাড়ির মেয়েরা বললেন, এটা কি শুধোবার কথা? যদি আমাদের একবেলা এক মুঠো জোটে তারও জুটবে। এতগুলো মানুষের মধ্যে একটা পেট কি বাড়তি হয়?''*

কমলার মতই নৃশংস পরিণতির শিকার মায়ার কথাও আমরা *‘হন্যমান’*-এ

পাই। মায়াকে বিক্রি হতে হয় এবং তা করে তার বাবা। লেখিকা লিখেছেন– *"বাবা আবার মেয়েকে বিক্রি করে? করে না! মায়ার চেয়ে ভাল কে জানে! বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে এদেশে এসেছে ওরা। ওর বাবা দু'শ টাকায় মায়াকে বিক্রি করেছিল যে লোকটার কাছে তার ছেলেমেয়ে মায়ার চেয়ে বড়। রাত্রে সেই লোক আর দিনে তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলে নিয়মিত ব্যবহার করেছে মায়াকে।"*[২৯] পিতার দ্বারা মায়ার বিক্রি হওয়া, বিক্রি হওয়ার পর পিতার বয়সী ব্যক্তি ও তার ছেলের দ্বারা মায়ার ধর্ষিত হওয়ার মত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তথাপি সভ্য সমাজের দৃষ্টি আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। জয়া মিত্র সভ্যসমাজের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সমাজের কদর্যতম রূপগুলিকেই বারে বারে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন *'হন্যমান'* বইটিতে।

'হন্যমান'-এ জয়া মিত্র যেমন জয়লক্ষী, গঙ্গা, ছোট কমলা, মায়াদের মত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মেয়েদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, তেমনি খুনের দায়ে জেলে আসা শান্তবালা কুইলা, ইতোয়ারী, শান্তা তামাঙ্গী, জায়দাদি, মহাক্কা বেগম, আনন্দ, কমলা দি, ফুলমালা বর্মণী, জলমণীর মত মেয়েদের কথাও সহানুভূতির সঙ্গে বলে যান। আমরা দেখতে পাই এদের খুনের দায়ে জেলে যাবার পেছনে থাকে অত্যাচার, নিপীড়ণ, লাঞ্ছনার নৃশংসতম ইতিহাস।

শান্তবালা কুইলার জেলে আসবার কারণ বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যার অপরাধ। লেখিকা লেখেন–

"শান্তবালা কুইলা বলে একটি মেয়ে এসেছে খুনের কেসে। কাঁথির কাছে কোথাও বাড়ি। বিবর্ণ রক্তহীন হলেও গোল মুখ। গোরুর চোখের মত কালো, মার খাওয়া চোখ। তেরো বছর ধরে নিরন্তর মার খেতে খেতেই এগারোটা ছেলে-মেয়ের মা। চারটে সকালসকাল মরে এখনও আরও সাতটা মুখ খাওয়াতে, বড় করতে। হালের বলদকে প্রতিদিন অন্ধকার থাকতে উঠে ভরপেট খাবার না দিলে জোয়াল টানবে না, শান্তবালাকে একটা সদয় কথা বলবারও কেউ নেই

বছরের পর বছর। অথচ সেই অনেক বছর সয়ে যাওয়ার পরও কেউ জানেন কোনটা উঠের বোঝায় শেষ খড় হয়, ঠিক কখন বাঁধটা ভাঙে। গলার রূপোর হার বিক্রি করে শেয়ালমারা বিষ কিনল শান্ত, ফেনভাতের সঙ্গে লঙ্কা আর বিষ মেখে খাওয়াল মাতাল লোকটাকে। সে মরে যেতে থানায় গেল সটান।''[৩০]

লেখিকা যেন দায়িত্ব নিয়েই খুনের দায়ে জেলে আসা শান্তবালা কুইলার খুনের মত গুরুতর অপরাধ করার কাহিনীটি আমাদের শুনিয়েছেন। আমরা জানতে পারি শান্তবালার স্বামীকে হত্যার পেছনে কারণ থাকে স্বামীর দ্বারা নিরন্তর অবহেলা, নির্যাতন এর মত ইতিহাস। তেরো বছরের বিবাহিত জীবনে এগারো সন্তানের জন্মদান। তাদের মধ্যে বেঁচে থাকা সাতটির মুখে ভাত দেওয়ার মত, বড় করবার মত গুরু দায়িত্ব শান্তবালার কাঁধে। এর পরিণতিতেই গলার রূপো মালা বিক্রি করে শান্তবালা শেয়ালমারার বিষ কিনে 'ফেন ভাতের সঙ্গে লঙ্কা আর বিষ মেখে' খাওয়ায় স্বামীকে। শান্তবালা কুইলার এই নিদারুণ কাহিনী শুনে পাঠকও শান্তবালাকে আর অপরাধী ভাবতে পারেনা। এখানেই লেখিকার দক্ষতা। লেখিকা নারীর বেদনাকে এতটা সহানুভুতির সঙ্গে পরিবেশন করেন যে পাঠকের অন্তরে তা গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে। লেখিকার সহানুভূতি প্রদর্শনে যে কৃত্তিমতা নেই তা অনুভূত হয়। শান্তবালার নিপীড়ণের কাহিনী বলতে লেখিকার যে বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন- *"তেরো বছর ধরে নিরন্তর মার খেতে খেতেই এগারোটা ছেলে-মেয়ের মা।''* বা *"অথচ সেই অনেক বছর সয়ে যাওয়ার পরও কেউ জানেনা কোনটা উঠের বোঝায় শেষ খড় হয়, ঠিক কখন বাঁধটা ভাঙে।''* নারীর বেদনাকে এধরণের বাক্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা একজন নারী আত্মজীবনীকারেরই সম্ভব। একদিকে তিনি খোঁজেন শান্তবালার প্রতি সমাজের সমবেদনা অন্যদিকে সমাজের সেই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তিনি, যেখানে শান্তবালার মত মেয়েরা লাঞ্ছনা নিপীড়ণের শিকার হয়ে অপরাধ করে এবং দেশের আইন তাদেরকে অপরাধী বলে গণ্য করে। আর 'অপরাধ'-কে

দেখার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকেই জয়া মিত্র গ্রহণ করেছেন। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মাঝেও কখনো বলে যান ইতোয়ারীর কথা। ইতোয়ারী বহরমপুর জেলে আসে স্বামীর মাথা মশলা ছেঁচার লোহায় ফাঁটিয়ে। ইতোয়ারীর অপরাধ করার কারণ লেখিকা আমাদের জানিয়েছেন। ইতোয়ারী ভালোবেসেছিল কোন ভিন্ন জাতের পুরুষকে। সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল কিন্তু জাত না মেলাতে সমাজের চোখরাঙানিতে ইতোয়ারীর বাবা-কাকা বিয়ে দেয় অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে। তার প্রতিক্রিয়াতেই ইতোয়ারীর এই অপরাধ। লেখিকার কাছে ইতোয়ারির অপরাধ বড় না হয়ে ইতোয়ারীর সন্তান বাৎসল্যই বড় হয়ে ওঠে। লেখিকা ইতোয়ারীর পরিচয় দানে লিখেছেন- *"দিন দশেক পর থেকে আবার ইতোয়ারী আসে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটুখানি হাসে। পিছনে মায়ের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ওর দু'বছরের ছেলে ভজা। আমি তাকে বলি ভজাকাকা, সে সাড়া দিতে পারে। ওর ছোট্ট গায়ে গেঞ্জিটা ওর মা কী করে জোগাড় করেছে জানি না, কিন্তু কোমরের ফুটো পয়সাওয়ালা কালো ঘুনসিটা কিনেছে এক মাসের পাওনা চার টুকরো মাছই কোন ওয়ার্ডারকে দিয়ে।"*[৩১] কারা প্রাচীরের ভেতর ইতোয়ারীর সন্তানের জন্য 'গেঞ্জি' জোগাড় করবার কিংবা *'কোমরের ফুটো পয়সাওয়ালা কালো ঘুনসি'* জোগাড়ের গল্প শুনিয়ে লেখিকা সমাজের লাঞ্ছনার শিকার, হওয়া আবার চোখেই অপরাধী ইতোয়ারীর প্রতি সমবেদনা আদায় করে নেন। লেখিকা আমাদের কাছে লাঞ্ছিত অসহায় ইতোয়ারীর বাঁচার স্বপ্নের কথা শোনান– *"মাথায় ডগডগে সিঁদুর পরা কালো কুচবুচে ছোট রোগা ইতোয়ারী সহজভাবেই বলে 'ভজা' তো আছে দিদি, ইয়াকে নিয়ে থাকব'। হাসলে ওর মুখখানা এমন উজ্জ্বল।"*[৩২] ইতোয়ারীর সন্তানকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন, মুখের হাসির উজ্জ্বল্য নারীর প্রতি সামাজিক অবরোধের কাঠামোগুলিকে প্রবলতর আঘাতই করে।

লেখিকা স্বামীকে হত্যা করে আসা নেপালী মেয়ে শান্তা তামাঙ্গীর মধ্যেও অপরাধী সত্তা না খুঁজে তার অসহায়তাকেই দেখাতে চান। লেখেন– *"শান্তা*

তামাঙ্গীকে সবাই বলে সিস্টার। ওকে দেখে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওর বয়েস বারো-তোরো বছর। সে কথা শুনে হেসেই অস্থির। দেখাল ওর নিজেরই আছে চার বছর আর তিন বছরের দুটো কাঁচকড়ার পুতুলের মত ফুটফুটে মেয়ে। সেগুলোকে নিয়েই এসেছে দার্জিলিং-এর বস্তি থেকে, তাদের বাবাকে কুক্‌রির কোপ মেরে। স্কুলে পড়ার জন্য সব লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করেছে তিন বছর। হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতেও দমেনি। পড়া বন্ধ করে দেবার ক্ষোভটা ছিলই তারপর নিজে উপার্জন না করে। বাচ্চাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেশা করে এসে, কান্তু বিন্দুকে মারায় রাগটা সামলাতে পারেনি। সাত বছরের মেয়াদ।''[৩৩] লেখিকা এখানে শান্তা তামাঙ্গীর স্বামীকে হত্যার পেছনে অকর্মণ্য, নেশাগ্রস্ত স্বামীর সন্তানদের প্রতি অবহেলা, অত্যাচারের ঘটনাগুলোকে আমাদের শোনান। শান্তার অপরাধকেও যেন আর অপরাধ মনে হয় না। শান্তা তামাঙ্গীর মধ্যেও লেখিকা তাঁর মাতৃসত্তাকে খুঁজে পান। লিখেন– *"ওই বন্ধনরকেও নেপালিদের সহজাত সৌন্দর্যবোধে বাচ্চাগুলোকে ফুলের মত রাখত সিস্টার''*[৩৪]

লেখিকা জায়াদাদি, মহাক্কাবেগম, আনন্দ, কমলাদি, ফুলমালা বর্মণী, জলমণি-র মত কারাবাসী নারীদের জেলে আসার কারণগুলিকেও বিস্তৃতভাবেই বলে গেছেন। বিভৎসতম জীবন অভিজ্ঞতাই এদের হত্যার মত গুরুতর অপরাধ করতে বাধ্য করেছিল। জায়াদাদি দুইবার তালাক পাবার পর তৃতীয় বার যে ব্যক্তিকে বিবাহ করেছিল সেই ব্যক্তি জায়াদাদির প্রথম পক্ষের মেয়েকে ধর্ষণ করে ছিল জয়াদিদি সেই ব্যক্তিকে দা দিয়ে কেটে ফেলে।[৩৫] মহাক্কা বেগমের নিজের স্বামীই তাদের মেয়ে সোনাভানকে ধর্ষণ করেছিল। মহাক্কা বেগম হত্যা করে স্বামীকে।[৩৬] দরিদ্র ঘরের মেয়ে আনন্দ প্রথমে স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে কাকাদের বাড়িতে আশ্রিত হয়, কাকাদের বাড়িতেই গতর খেটে খাওয়ার দাম শোধ করেছিল আনন্দ, কিন্তু থাকার দাম শোধ করতে হয় তাদেরই একজনের বিছানায়। কাকার দ্বারা বিবাহের আশ্বাস পেয়েছিল কিন্তু সেই কাকাই অন্য মেয়েকে বিয়ে করলে

আনন্দ হত্যা করে বসে কাকার নতুন স্ত্রীকে।[৩৭] কমলাদি সতেরো বছরে বিধবা হয়েছিলেন। বৈধব্যের পর নিজের বিধবা মায়ের সঙ্গে যে মেজকর্তার বাড়ির কাজ করে জীবন অতিবাহিত করছিল সেই মেজকর্তাই বিধবা কমলাদির গর্ভে সন্তান এনেছিল। পরে বিধবা কমলাদির গর্ভধারনের অপরাধে মেজকর্তাই আবার তাঁদের গ্রাম ছাড়া করে। সন্তান জন্মালে কমলাদি হত্যা করে নিজের সন্তানকে। কমলাদির হত্যার বিচারে আদালতে মেজকর্তাও কমলাদির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করে।[৩৮] ফুলমালা বর্মণী পারিবারিক জীবনের লাঞ্ছনা সইতে না পেরে নিজের দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে নিজেও আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে অসফল হয়। পরিনতিতে সন্তানদের হত্যার দায়ে জেল হয় ফুলমনি বর্মনীর।[৩৯] জলমণি প্রথমে স্বামীর লাঞ্ছনার শিকার হয় পরে ছলনার শিকার হয় অপর পুরুষের। জলমণি হত্যা করে তার প্রেমিকের প্রেমিকাকে।[৪০] লেখিকা অপরাধীকে বড় করে না দেখে অপরাধের কারণগুলিকেই বড় করে দেখেছেন। জীবন সম্পর্কে লেখিকার যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি রয়েছে নারীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি। লেখিকা কারাবাসীর জীবনের কথার মধ্য দিয়ে সমাজের একেকটা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। বহরমপুর জেলবাসী বুধার জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করেছেন। বুধা ছিল কোন আরণ্যক উপজাতির মেয়ে। দুইবার বিয়ে হয়েও সন্তান না হবার কারণে নিজের জেঠিকে ডাইনি' সন্দেহে হত্যা করে ছিল। এই বুধার বিশ বছরের জেল হয়। জেলে বছরখানেক কাটাবার পর বুধা আত্মহত্যা করে। বুধার মৃত্যুতে লেখিকা আক্ষেপ করে শোনান–

" পাথর হয়ে যাওয়া মন ও কয়েকদিন বড় উদাস স্পৃষ্ট হয়ে থাকে, বুধার জন্য। যেন অন্য কোন গ্রহের প্রাণী এমন সুদূর থেকে এসেছিল। ভূগোলে আর কতদূর কিন্তু মানভূমের ঘন জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত তার গ্রাম সমস্ত থেকেই বহু বহু সময় দূর এই শহর থেকে, এর সংগঠিত সভ্যতা থেকে। সেই গ্রামের বাইরে মেয়েটি কোনদিন যায়নি, সাঁওতাল সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজ সে

জানে না। সাঁওতালি ছাড়া অন্য কোনও ভাষা সে বোঝে না। সেই সমাজের রীতিনীতি থেকে আকাশ পাতাল ভিন্ন'তার পৃথিবীতে অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন এক সংবিধানের অধীনে তার সম্পূর্ণ অবোধ্য এক ভাষায় এবং তার বোধের সম্পূর্ণ বাইরে স্থিত অপরাধে তার বিচার হয়ে গেল। যে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব, কোনো ভূমিকা তার কিংবা তার গ্রামবাসীদের জীবন ধারণে কখনওছিল না, বুধার জীবনের কুড়িটি বছর কেড়ে নেবার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্র দেখা দেয়। যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার অলীক ঠাট্টা তাদের দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে আইন, দণ্ডবিধির সমতা।'' [৪১]

'হন্যমান'-এ লেখিকা জয়া মিত্রের জীবন দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, মানবিকতাবোধ সমাজের প্রান্তবাসী মানুষকেই আলোকিত করেছে। সমাজ ব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষ্ট অতিসাধারণ মানুষের জীবনের খবর সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত রূপকেই তুলে ধরে। *'হন্যমান'*-এ আমরা খাঁদি বাউরির মত সাধারণ জেলাবাসীর পরিচয় পাই। খাঁদি বাউরি জেলে আসে সংরক্ষিত জঙ্গলে কাঠ কাটার অপরাধে। খাঁদি বাউরি ও তার স্বামী দুজনেরই জেল হয়। বাইরে থেকে যায় তাদের সন্তানেরা। লেখিকা খাঁদি বাউরির অসহায়তার ছবি এভাবে আঁকেন–

"খাঁদি বাউরির যদি বছরে বছরে ছেলে হয়, তার দায় কারো নয় তারা যদি খেতে না পেয়ে কাঁদে এবং পাঁচ বছর ও চার বছর বয়সে একটি মাত্র বাঁশও যদি হাটতলায় বয়ে নিয়ে যেতে না পেরে পড়ে দাঁত ভাঙে, সেটা নিশ্চয়ই খাঁদি ও তার দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীরই দোষ। সুতরাং জ্বোরো ছেলেকে ভাত খাওয়াবার অজুহাতে সংরক্ষিত জঙ্গলের কাঠ কাটা এই অপরাধকে লঘু করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয় এবং জেল হবার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। দুজনের জেল হলে বাচ্চাদের কী হবে– এমন অদ্ভুত আবদারের কারণ আসলে অশিক্ষা, আইনের অলঙ্ঘনীয়তার মহিমা বুঝতে না পারা। খাঁদি বউদি কাজেই সকাল-সন্ধ্যে কাঁদে, রুটি গুঁড়ো করে মেখে দিয়ে সংসারে খেতে দেবার সাধ মেটায়, ভোরপাত্রে উঠে

আমার পা টিপে দেবার চেষ্টা করে বকুনি খায়।'' [৪২]

লেখিকা এখানে খাঁদি বাউরির পরিচয় খানিকটা তীর্যকভাবে দিলেও বোঝা যায় তার সহমর্মিতার দিকটি। খাঁদি বাউরি প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজের সেই বৃহত্তর বর্গেরই প্রতিনিধিত্ব করে যারা ডুবে থাকে অশিক্ষা, অভাবের বেড়াজালে। রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধাগুলো তাদের ধারে কাছে পৌঁছয় না। লেখিকা যে বলেন– *"খাদি বাউরীর যদি বছরে বছরে ছেলে হয় তার দায় কারো নয়। তারা যদি খেতে না পেয়ে কাঁদে এবং পাঁচ বছর ও চার বছর বয়সে একটি মাত্র বাঁশ ও যদি হাটতলায় বয়ে নিয়ে যেতে না পেরে পড়ে দাঁত ভাঙে, সেটা নিশ্চয়ই খাঁদি ও তার দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীরই দোষ।''* প্রকৃত অর্থেই তাই। খাঁদি বাউরির মত মানুষদের দায়িত্ব জনহীতকর সরকার বা আমাদের সভ্যসমাজ নেয়না। সমাজে খাঁদি বাউরির মত মানুষেরা ব্রাত্যই থেকে যায়। আমাদের সমাজ জিইয়ে রাখে এই মানুষদের সঙ্গে আর্থিক-সামাজিক বৈষম্যকে। অল্প বয়সে লেখিকা মার্ক্সীয় চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে ঘর ছেড়ে ছিলেন তাই হয়তো বা সমাজের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চিত্রগুলি খুব সহজেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে।

'হন্যমান'-এ জয়া মিত্র জেল জীবনের বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মাঝে কারা প্রাচীরের ভেতরকার অব্যবস্থার চিত্রগুলিও তুলে ধরেন। আমরা যারা কারা প্রাচীরে বাইরে সভ্য সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি, ভুলে থাকি কারাপ্রাচীরে ভেতরকার জীবনগুলির কথা *'হন্যমান'* সেই অসচেতনাকেই আঘাত করে। আমরা দেখতে পাই কারা প্রাচীরের অব্যবস্থার পেছনে দায়ি থাকে জেল প্রশাসনের চরমতম দুর্নীতি, অবহেলা, অমানবিক আচরণের মত কারণগুলি। *'হন্যমান'* কারাপ্রাচীরের ভেতরকার দুর্নীতির অসংখ্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। কারাপ্রাচীরের ভেতরকার এই দুর্নীতির পরিচয় দান লেখিকার জেল পরিবেশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিনে নেবার ক্ষমতারও পরিচায়ক। লেখিকা কতটা গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় কারাপ্রাচীরের দুর্নীতির পরিচয় দান করেছেন প্রেসিডেন্সি জেলের চুড়ি প্রসঙ্গটিকে

তুলে ধরলেই বোঝা যায়–

“এখানে সকালের খাবারটাও অপেক্ষাকৃত নাগরিক। মেদিনীপুর বহরমপুরের মত রোজ ভুট্টার খিচুড়ি নয়। একদিন করে চিঁড়ে-মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ। এমনকি সপ্তাহে একদিন পাউরুটি। সবই পরিমাণে অত্যল্প। অবশ্য তার কতটা হিসেবের বরাদ্দ আর কতটা চৌকা, পাহারা, সেপাই, হাসপাতাল ইত্যাদি ছাঁকনিতে ছাঁকা হতে হতে এসে পৌঁছয়, তার হিসেব আলাদা। সকালের খাবার আসে তিনবার। সাধারণ বন্দীদের বরাদ্দ উপরোক্ত ব্যাপারটা, কাগজ-কলমে হাসপাতালে ভর্তি আছে যে পেশেন্টরা, তাদের ডাক্তার নির্ধারিত ডায়েট আর ওয়ার্ডের পাগলদের জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণে হরিণঘাটায় সবচেয়ে বড় দু'টি কনটেনার ভর্তি দুধ, লোহার একটা বিশাল ট্রেতে আশিজনের প্রত্যেকের নামে কোয়ার্টার সাইজের পাউরুটি, দেড়-দুই কিলো চিনি, একথালা ভর্তি চাপাতা, ডিম সেদ্ধ, আপেল, লেবু, মাখন। এই শেষ দু'ভাগের খাবার গেট দিয়ে ঢুকে হাসপাতালে চলে যায়। অন্তত বেলা দশটার আগে তার আর কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ছোট বালতির এক বালতি খিচুড়ি বা ছোলা সেদ্ধ বা চিঁড়ে, গোটা কুড়ি টুকরো পাঁউরুটি আর একটা বড় বালতি ভর্তি টলটলে পাতলা চা পাগল ওয়ার্ডের দিকে চলে যায়। সে ওয়ার্ডের চলতি নাম পাগল বাড়ি। হাসপাতাল ডায়েট প্রাপকদের দু'চারজনের কাছ পর্যন্ত আসে। দৈনিক চা, চিনি আমরা ঠিক পেয়ে যাই। বাকি যাদের নাম হাসপাতালের অসুস্থ লিস্টে এন্ট্রি করা আছে, তারা তা জানেওনা। আর জানলেই বা কী করতে পারে! হাসপাতালের ডায়েট আসলে সর্বজনীতভাবেই প্রিভিলেজড বন্দীদের আলাদা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু সত্যি তো অতো খাবার শিখা, লালমতি, সরযূ, তাদের তাঁবেদার আট-দশজন মেয়ে আর প্রতি ডিউটির দু'জন করে মোট আঠারজন ওয়ার্ডারের পক্ষে খেয়ে ফেলা সম্ভব নয়! তা তারা খায়ও না। পুরোটা থেকে বেছে কেবল সবচেয়ে ভালো অংশটুকুই খায়। তাহলে কী হয় এই অবিশ্বাস্য পরিমান খাবার! অধিকাংশ

জিনিসই ওয়ার্ডারদের ঘাঘরার নিচে সেলাই হয়ে, কোমরের কাপড়ে আড়াল হয়ে বাইরে চলে যায়– চিনি, তেল, দুধ জমানো খোয়, ফল, ডিম আর টাকা হয়ে ফিরে আসে। প্রেসিডেন্সিতে বন্দীদের অবস্থা যাই হোক, কোন জিনিসের কার্পণ্য নেই। প্রথমদিন হাসপাতালে আমি যে গজ কাপড়ের মশারি ও মোটা মোটা পাশাবালিশ দেখেছিলাম, সেই গজ কাপড়ের থান ও বোরিক তুলোর বান্ডিল আসে মেয়েদের শারীরিক প্রয়োজনে। খাবার ব্যতীত এই সব কিছুই বিছানার চাদর, কেরোসিন তেল, সর্ষের ও নারকোলের তেল, ফিনাইল ঝাঁটার কাঠি এমনকি জেলের থালাবাটি পর্যন্ত এইভাবে বাইরে যায়। জেলে বসে উপার্জিত টাকা থেকে তারা কোর্টের কলকব্জায় তেল দেয়, যাতে তাদের কেস কোর্টে না ওঠে, ফাইল নিচে চলে যায়। বাইরে এই আয়াসে এই টাকা উপর্জন করার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। সে মনুষ্যনাম প্রাণীরা এইভাবে সর্ববোধ শূন্য হয়ে টাকা কামানোর মানসিক এলেম রাখে তাদের কাছে ঘর-পরিবারের টান বলে কিছু থাকে না। তারা এই সমাজের শিকড়হীন, কুশ্রী, লোভ আর স্বার্থপরতার নিচুতলার চেহারা। জেলের চাকা চালু রাখা প্রয়োজনীয় নাটবল্টু ও এরাই।'' [৪৩]

লেখিকার অনিয়মকে মেনে না নেওয়ার স্পর্ধা। তার থেকেও বেশি জেলের সাধারণ বাসিন্দাদের জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকেই হয়তো জেলের অনিয়ম দুর্নীতির প্রসঙ্গগুলি এতটা আনুপুঙ্খভাবে এসেছে। লেখিকার এই প্রয়াস পাঠক কুলকেও কারাপ্রাচীরের বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। কারাপ্রচীরের অনিয়ম দুর্নীতির এইরূপ বর্ণনা এক প্রকার সমাজ বদলের লড়াই এরই সমান। লেখিকা তাঁর কারাবাসকালীন জীবনে সশরীরেও যে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরোধিতায় নামেন তার খবরও আমরা পাই।

কারাপ্রাচীরের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, মানবিকতার লঙ্ঘন প্রশ্নে কারাপ্রাচীরের ভেতর পাগল বন্দিদের অবস্থার চিত্র *'হন্যমান'*-এ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। লেখিকা গভীর সমবেদনায় জেলের পাগল বন্দিদের কথা বলেন। লেখিকা বহরমপুর

জেলের আয়তামাঈ-এর কথা জানিয়েছেন। অন্তঃসত্তা অবস্থায় সে স্নায়বিক ভারসাম্য হারিয়ে ছিল, আশ্রয় পেয়েছিল বহরমপুর জেলে। তারপর সন্তান জন্মালে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জেলপ্রাচীরের অমানবিকতার পরিবেশে আয়তামাঈ এর সন্তান কেড়ে নেওয়া হয়। জয়া মিত্রের কথায়–

"একটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, আয়তামাঈ হঠাৎ মেট্রনের মনে হয়েছে, আয়তামাঈ বাচ্চা নিয়ে ভারি চুপচাপ বসে আছে। ও আগে পাগল ছিল। সুতরাং ফরমান জারি হল বাচ্চা সরিয়ে নাও-আয়তা বাচ্চাকে কোলে নিতে বা দুধ খাওয়াতে পারবে না। বন্দীদের ভাগের খাবারে পুষ্ট শরীর, এই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিটির সূক্ষ বিচার ও নির্দেশ নিরক্ষর একগুঁয়ে মাটির পছন্দ হয় না এবং অবাঞ্ছিত জোরে সঙ্গে সে নিজের আপত্তি প্রকাশ করে। পুষ্প নেইয়ার শাড়ির আঁচল ফেঁসে যায়, আয়তামঈয়ের চোখের কোলে ও খোলা পিঠে নীল সবুজ হয়ে রক্ত জমে থাকে। বাচ্চাটা সারারাত্রি কাঁদে। তার নামে বরাদ্দ চিনি, মেট্রন ও ওয়ার্ডারের পবিত্র চা সরবতে যুক্ত হয়। মাটির নাম ধরিত্রী তাই সমস্ত রাত্রি মায়ের বুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া দুধ সেলের মেঝেয় জমে থাকে জ্বলে ওঠে না, ফেটে পড়ে না, ধ্বংস করে দেয় না! অসহায় চিৎকারে বিদীর্ণ আয়তাঈমাই চলে যায় লালগোলায় পাগলদের জেলে। কয়েকদিন দুধ চিনির জোগান দিয়ে। দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচ্চাটা মরে যায়।"[৪৪] লেখিকা যে জেলের পাগল বন্দীদেরও বিশেষ সহানুভূতির চোখেই দেখতেন আয়তামাঈ এর কাহিনী তার প্রমাণ দেয়। তীব্র বচনে তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন জেলের অমানবিকতার পরিবেশের।

লেখিকা পাগল মালতির কথা বলেন, সে জেলে আসে। বারে বারে! অন্তঃসত্তা অবস্থায়। লেখিকার কথায় – *"আবার মালতী এসেছে। মালতী আবারই আসে। বারবার জড় বুদ্ধি। চেহারাতেও জান্তব বিকৃতির ছাপ। রিপু বলতে শুধু লোভ, খাবার লোভ। তবুও জন্তু নয়। ওর শরীরও নারী বলে প্রতিভাত হয়।*

কোর্টে ঢুকে গন্ডগোল করবার দায়ে আসে বারবার। প্রায় প্রতিবারই অন্তঃসত্ত্বা।'' গতবার মাস আস্টেক আগে এসেছিল ছোট্ট ফরসা ছেলে কোলে। সারাদিন মানিকচাঁদকে আদর করত, কোলে ফেলে বিচিত্র স্বরে গান গাইত। সত্যিকারের যে কোন মা! এবারও পা ঘষে ঘষে এসে দাঁড়াল মেলের সামনে। সেই একই চেহারা। জন্তুর মত নির্বোধ হাসি। শরীরে মানুষদের লোভে ক্লিন্ন ভার। জিজ্ঞেস করি, মানিকচাঁদ কই মালতী?

ভাবতেই পারিনি আধফরসা মুখ এমন কুঁচকে মালতী হঠাৎ কেঁদে ফেলবে। চা-মিষ্টির দোকানে বারে বারে বিরক্ত করেছিল বলে, গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছিল। ও তো ঠিক মানুষ নয়!''[৪৫] পাগল মালতির মত মেয়েরা আমাদের সমাজে মানবিক আচরণ না পেয়ে হয় পাশবিকতার শিকার। লেখিকা স্পষ্ট করে না বললেও মালতির বারে বারে অন্তঃসত্তা হয়ে জেলে আসা, ধর্ষণের মত পাশবিকতার শিকার হওয়ার ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে। পাগল মালতিও একজন মা আর সেই মা'কে সন্তানের মৃত্যুর বেদনা কাঁদায়। পাগল মালতির সন্তান বিয়োগের আর্তনাদ– *"মানিকচাঁদ মইরা গেছে দিদি গো।''*[৪৬] আমাদের সমাজের অমানবিকতার পরিবেশকেই খুব বেশি করে ফুটিয়ে তোলে।

কারাপ্রাচীরে পাগলদের ওপর কিরূপ অমানবিক আচরণ করা হয় জানা যায় প্রেসিডেন্সি জেলের অন্তঃসত্তা পাগল মেয়েটির কাহিনী থেকে। লেখিকা নাম না জানা সেই অন্তঃসত্তা মেয়েটির কাহিনী লিখেছেন যাকে অন্তঃসত্তা অবস্থায় রাস্তায় ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াবার জন্য পুলিশ জেলের 'সেফ কাস্টডি'তে রাখেছিল। অন্তঃসত্তা এই মেয়েটির ওপর করা হয় পাশবিক অত্যাচার। বিকেলে সেফ কাস্টডিতে জমা পড়বার সময় ওয়ার্ডারের ডাকে সাড়া না দিলে অন্তঃসত্তা এই মেয়েটি অত্যাচারিত হয়। আবার পায়ে বেড়ি বেঁধে পা দু'টিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় গারদের গায়ে। পরে প্রসব যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হয়। নিদারুণ এই কাহিনী লেখেন লেখিকা। এই কাহিনীটি বলতে জেলের সেফ কাস্টডি প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে

বলেছেন- *"পুলিশ তাকে 'সেফ কাস্টডি'তে রেখেছে। এই শব্দটি যিনিই 'কয়েন' করে থাকুন তাঁর তিক্ত রসবোধের সামনে টুপি খুলতেই হয়। যেমন নাজি ডেথ "চেম্বারগুলির ওপর লেখা থাকত 'শ্রমমুক্তি'। এরকম ব্ল্যাক হিউমারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিপীড়করা সবাই উদ্ভাবক।"*[৪৭] লেখিকার জেলের 'সেফ কাস্টডি'-র সঙ্গে 'নাজি ডেথ' চেম্বারের এই তুলনা। আমাদের সম্মুখে কারাপ্রাচীরের বিভৎসতাকে আরও প্রকট করে তোলে। আমরা লেখিকার বোধের জায়গাটিরও পরিচয় পাই। অন্তঃসত্তা পাগল মেয়েটি অত্যাচারিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলের শিখা, সরযূ, লালমতিদের মত মেটদের দ্বারা যারা জেলে বন্দি আছে ঘৃণ্যতম অপরাধে অপরাধী হয়ে। লেখিকা এদের প্রসঙ্গে লেখেন– *"এরা সবাই ধারণ করেছে সন্তান। জেনেছে সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার কথা। কিন্তু জেলে সবকিছুই এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে কেন? এজন্যই কি যে, যে হীন সেই গুরুত্ব পায় সুন্দরের ওপর? ভীতুর হাতে অধিকার থাকে সাহসীকে শাস্তি দেবার? অযোগ্যতমের হাতে থাকে মর্যাদাসম্পন্নকে শাসন করার ক্ষমতা? খুঁজে খুঁজে মানবতার কনামাত্র বোধহীন লোকদেরই এনে রাখা হয়, অসহায় মানুষদের নিপীড়ণ করার ক্ষমতার অধিকারী করে। বদ্ধজল পচে যায়। বদ্ধ মানুষ পচে যায় আরো অনেক বেশি।"*[৪৮] জেল পরিবেশের এইরূপ পরিচয় জেলের বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে, বোঝা যায় লেখিকা কতটা বিচক্ষনতায় জেল পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

লেখিকা কারাপ্রাচীরের পাগল বন্দিদের ওপর মানবিকতা লঙ্ঘনের আরও অনেক বিভৎস কাহিনীর কথা বলেছেন। যা আমাদের সভ্যসমাজের চিন্তারও অতীত। লেখিকা পাগলদের পাগল বলেই অবহেলার চোখে দেখতে চান নি। দেখতে চেয়েছেন আর পাঁচটা মানুষের মত করে তাই হয়তো বহরমপুর জেলের পাগল বন্দি লেখিকার কাছে নিজের সন্তানের মৃত্যু দুঃখে কান্নায় ফেটে পড়ে, প্রেসিডেন্সি জেলের টুরা নিজের কাপড়ের জন্য পায়ের ক্ষতের চিকিৎসার জন্য

অভিমান-রাগের কথা বলতে পারে, প্রেসিডেন্সি জেলের নাম না জানা পাগল মেয়েটি নিজের পায়ের 'ঘা' দেখিয়ে নিজেই ছোটবেলায় পাওয়া আদর স্নেহ ভালবাসার কথা জানায়।

একটা মানবিকতাবোধের চালিকা শক্তিই যেন *'হন্যমান'* বইটির প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের জেল জীবনের এই স্মৃতিচারনায় জয়া মিত্র কারাপ্রাচীরের ভেতরকার মায়েদের-শিশুদের অসহায়তার কথাও বলে যান। যা জেলের বাস্তবতার সঙ্গে পাঠকে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করে। এসেছে সখী খাতুনের মত মায়েদের কথা। সখী খাতুনকে জেল মুক্তির পূর্বে সন্তানের কাছে শুনতে হয়- বাড়ি গেলে সেখানে তাদের কে লকআপ করবে। লেখিকার কথায়– *"সখী খাতুনের তিন বছরের সাজা শেষ হয় বাড়ি যাবার দিন সাতেক আগে, বছর তিনেকের ছেলের পিঠে এক বিরাশি সিক্কার দড় সন্ধ্যেবেলায়। কী হয়েছে সখি? সখি ভ্যাঁ করে কেদে ফেলে, দেখ দিদি কি অলক্ষণ কথা বলে। ছেলে শুধাচ্ছে- মা ওয়ার্ডার না গেলে, ঘরে আমাদের কে লকাপ কইরবে?"*[৪৯]

এখানে সখী খাতুনের ছেলের প্রশ্ন কারাপ্রাচীরের অভ্যাসেরই দান। কারণ কারাগারের বাইরে জীবন সে জানেনা। কারা প্রাচীরের ভেতরকার বাচ্চাদের স্বাভাবিক জীবনের অজ্ঞানতা সম্পর্কে লেখিকা বিচ্ছিন্নভাবে আরও অনেক পরিচয় দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি জেলের বাচ্চাদের সম্পর্কেই যেমন বলেন-

(১) "ওরা বেড়াল চেনে, ইঁদুর-আরশোলা ও চেনে, কিন্তু কুকুর দেখেনি।"[৫০]

(২) "ওরা জানে না ভাত বেড়ে খেতে দেবার মানে কী। ওরা জানে কালো কুচ্ছিৎ লোহার ড্রামে করে আসা ভাত আর ডাল। না-মাজা কালো বালতিতে কালো ঘাঁটা পিচ্ছল তরকারি। ওরা জানে গ্লাস চাইতে নেই। ভাত খেতে বসে কোনদিন বিষম লেগে গেলে কাশতে কাশতে স্নানের ঘরে যেতে হয়। মগে করে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে খেতে হয়।"[৫১]

এইভাবেই কারাপ্রাচীরের অমানবিক পরিবেশে এক একটা মানুষের অসহায়তার ছবি এঁকে গেছেন জয়া মিত্র।

'জেল কোড' অনুসারে ছয় বছরের অধিক বয়সের বাচ্চাদের মায়েদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার নিয়ম। বাচ্চাদের স্থান হয় সরকারী হোমে। লেখিকা জেলবাসী মায়েদের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের কেড়ে নেবার ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। মানবিকতার যুক্তিতে তিনি লিখেছেন- *"এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা করে মায়ের কাছ থেকে সেই বাচ্চাকে সরকারি উদ্ধার শ্রমের নরকে পাঠিয়ে দিতে পারে মেট্রন বা যে কোনো ওয়ার্ডার শুধু একবার অফিসে এই কথাটি পৌঁছে দিয়ে যে বাচ্চার বয়স ছ'বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এবং সেই সব বাচ্চাকে আর কোথাও পাঠানো হয় না, কোন ভালোবাসার সুস্থতার পরিবেশে। কোথাও নয়, একমাত্র সরকারি উদ্ধারাশ্রম ছাড়া। জেলের মধ্যে ওই একটিমাত্র অবলম্বনে একটি মেয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে- তার বাচ্চা ঘিরে। কোন মানসিক সংশোধনের জন্য এইসব 'সংশোধনাগার' থেকে মানবিক সমস্ত অবলম্বন ছিঁড়ে নেওয়া হয়। একথা নিশ্চয়ই আইনপ্রণেতারা জানেন। মাথার ওপর এই 'লিলুয়া নিয়ে যাবে'র খাঁড়া ঝুলতে থাকায় মেট্রন, ওয়ার্ডার, সিপাহি, মেট, পাহারা সকলের পায়ের নিচে পাপোষের মত হয়ে থাকে মহাক্কাদি, তিন বাচ্চা নিয়ে আসা বিশবছরী মাজেদা খাতুন, দুই বাচ্চার মা সখী, দুই বাচ্চার মা চন্দনী আরও বাকি যত বাচ্চা মায়েরা।"*[৫২]

জেলের মায়েদের সন্তান কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গে লেখিকার উদ্ধৃত এই বক্তব্যে যেমন প্রতিবাদী স্পৃহা আছে তার পাশাপাশি আছে যুক্তিগ্রাহ্যতাও। আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কারাগার বা জেলখানার মানবিক নামকরণ করা হয় 'সংশোধনাগার' বলে কিন্তু সেই সংশোধনাগারে একজন মায়ের সন্তান কেড়ে নেওয়া সত্যই কি মানবিক। লেখিকার উত্থাপিত এই প্রশ্ন-

"জেলের মধ্যে ওই একটিমাত্র অবলম্বনে একটি মেয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তার বাচ্চা ঘিরে। কোন মানসিক সংশোধনের জন্য এইসব 'সংশোধনাগার' থেকে মানবিক সমস্ত অবলম্বন ছিঁড়ে নেওয়া হয়।''— আমাদের একবার ভেবে দেখতে হয়। জেলের মায়েদের কাছ থেকে সন্তান কেড়ে নেওয়া লেখিকার কাছে মানবিকতার লঙ্ঘন হিসাবে আখ্যায়িত। তেমনি লিলুয়ার মত সরকারী হোম বা উদ্ধারাশ্রমে বাচ্চাদের পাঠানো নিয়ে শঙ্কিত তিনি। আসলে লিলুয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে লেখিকা অবগত ছিলেন। লিলুয়ার পরিচয় জয়া মিত্র দিয়েছেন- *"লিলুয়া তো এক নরক। শুনি সরকারি উদ্ধারশ্রম আর লিলুয়া থেকে আসা মেয়েদের সবার থেকে আলাদা করে চেনা যায় সর্বাঙ্গে ঘা দেখে। একটামাত্র জলাশয়। তার জল পঁচে সবুজ হয়ে গেছে। সেখানেই স্নান করে আর কাপড় কাচে ওরা। একবার সেই উদ্ধারাশ্রমের গুদাম বোঝাই হয়ে গেলে আর বেরোনো যায় না। চার মাস কি ছ'মাস জেলে থাকবার পরও যে সব হারিয়ে যাওয়া বা ধর্ষিতা মেয়েদের কেউ নিতে আসে না, তাদের জমা করে দেবার জায়গা লিলুয়া হোম। যেমন পঁচে পঁচে সবুজ হয়ে ঘা ছড়ায় বদ্ধ জলা- মানুষ তো তার চেয়েও বেশি। কত বীভৎস অত্যাচার আর বিকৃত যে শিকার করতে পারে ক্রমাগত বন্ধ থাকা মানুষের মনকে, তার কিছুটা মাত্র আন্দাজ করেছিলাম আনোয়ারাকে দেখে। তিন বছর চার বছর কি সাত বছর বয়স থেকে যে শিশুরা কিংবা কিশোরী-তরুণীরা বন্ধ হয়ে আছে সর্ব অর্থে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, পরিবার-পরিজন-সমাজ-সামাজিক শ্রম-সমস্ত রকম বন্ধন*

থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের বিকৃত হয়ে উঠতে পারে তা দেখতে বোধ হয় লিুয়ায় যাওয়া যায়। নাঃ- যাওয়া যায় না। কেন না লিলুয়ায় বাইরের জনপ্রাণী খবর-বাতাস সম্বন্ধাদির প্রবেশের নিয়ম নেই। সমকামিতা ওখানে বাচ্চা থেকে প্রৌঢ়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক (?) আউটলেট।''[৫৩]

জেল প্রাচীরের বাস্তবতার এইরূপ টুকরো টুকরো ছবিগুলি পাঠককুলের জেল প্রাচীরের অজ্ঞানতা দূর করে গেছে। সরকারী উদ্ধারাশ্রম লিলুয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত থেকেই জয়া মিত্র প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন ওয়েলফেয়ার অফিসারের মাধ্যমে 'জেলকোড' অনুসারে সেখানকার বয়স উত্তীর্ণ বাচ্চাদের না পাঠিয়ে কোন সমাজসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থায় দুই মিশনারী প্রতিষ্ঠান বাচ্চাদের নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয় ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে।

লেখিকার কথায়– *"হিন্দু ধর্মের কোনো রক্ষাকর্তারা রাইটার্সে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ঘরে এসে বিক্ষোভ জানিয়েছেন হিন্দু বাচ্চাদের ক্রিশ্চান মিশনারিদের হাতে তুলে দিয়ে ধর্মান্তরিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে। সুতরাং ফাইল যখন একবার নড়েছে তা থামল একেবারে একটা ব্যবস্থা পাকা করে।*

নিজের নিজের ধর্ম ও উকুন মাথায় নিয়ে বাচ্চারা চলে গেল অনাথ আশ্রমে-লিলুয়ায় আর বহরমপুর বোর্স্টাল জেলে।''[৫৪] আলাদাভাবে লেখিকার এই ঘটনার উল্লেখে আমাদের সমাজের ধর্মান্ধতার দিকটিই প্রকাশিত হয় আবার দেখতে পাওয়া যায় জয়া মিত্র ধর্মরক্ষার তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জেলের বাচ্চাদের সুস্থ পরিবেশে বাঁচার বিষয়টিকে।

'হন্যমান'-এ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে দেহ ব্যবসার কাজে নিযুক্ত বাপীদি, ছাবরাদি, শ্যামাবাই, শান্তা বাইদের মত মেয়েদের জীবনের গল্পগুলি। লেখিকা এদের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখেন–

(১) *"বাপীদি-ছাবরাদি-রা আসে সাধারণত মাসের শেষ দিকে একবার। পুলিশদের নাকি কেসের কোটা পুরো না হলে ওদের দল ধরে তুলে আনে। দু'দিন পরে চলে যায়।''* [৫৫]

(২) *"বাপীদি বেশ্যা। এক-দু'মাস অন্তরই ঘুরে ঘুরে আসে। জেলের ভাষায় ওরা হল পেটি কেসের আসামী। দু'তিন দিনের সাজা নিয়ে আসে যায়।''* [৫৬]

আবারো বলবো এই সকল পরিচয়গুলি জেলপ্রাচীরের অপরিচয়কে দূর করে যায়। যা হয়তো লেখিকা এক বিশেষ দায়বদ্ধাতার সূত্রে করে যান। তবে লেখিকার প্রয়াস এখানেই শেষ হয় না লেকিকা খুঁজে চলেন বাপীদির মত মেয়েদের বেশ্যা হয়ে ওঠার পেছনের কারণগুলিকে, এদের জীবনের সুখ-দুঃখ নিরাশার পরিসরগুলিকে। লেখিকা বাপীদির বেশ্যা হয়ে ওঠার গল্প শুনিয়েছেন। আমাদের সমাজে বেশ্যাবৃত্তিতে আসতে বাধ্য হয়েছে এরকম অনেক দরিদ্র ঘরের মেয়েই রয়েছে যারা প্রথমে সমাজের স্বাভাবিক স্রোতেরই মানুষ ছিল কিন্তু কোনভাবে জীবনে ছলনার শিকার হয়ে স্থান পেয়েছে নিষিদ্ধপল্লীতি। বাপীদি তাঁর প্রেমিকের হাতে ছলনার শিকার হয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে আসে। বিস্তৃতভাবেই লেখিকা বাপীদির বেশ্যা হয়ে ওঠার গল্প শোনান। শহরতলির ঘিঞ্চির বাসিন্দা বাপীদির বাবার অনেক ছেলে মেয়ের মধ্যে একজন। চরম অভাবের, অশান্তির পরিবেশে জীবনের একমাত্র-বিনোদন হিন্দি সিনেমা। হিন্দি সিনেমার অলিক-রঙিন প্রেমের স্বপ্নাতুর আবহে বাপীদির কোন হোমগার্ড ছেলেকে ভালোবাসা, পরে সেই ছেলের হাতেই আড়াইশো টাকায় বিক্রি হওয়া।[৫৭] বাপীদির মত অভাবি ঘরের মেয়েদের বেশ্যা হওয়ার জন্য লেখিকা দায়ী করে যান সমাজে অলীক স্বপ্ন নির্মাতাদেরই।

"কারা তৈরি করে স্বাভাবিক সাধ আহ্লাদের সুযোগ নিয়ে এইসব রঙিন লোভ দেখানো স্বপ্ন? কেন করে। যাতে বাজারে সহজলভ্য হয় বাপীদিরা।''[৫৮]

লেখিকা যেমন দেখতে পান বাপীদির মত মেয়েদের, যারা বাণিজ্যিক

বিনোদন মাধ্যমগুলির দ্বারা অলিক জীবনচর্চার স্বপ্নে কবলিত হয়ে জীবনে ভুল পথে এগিয়ে যায়। তেমনি আজকের বৃহৎ সমাজও কিন্তু প্রতিমুহূর্তে বাজারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলে। *'মেরা স্বপ্না মেরা মারুতী'র* মত বাজারি বুলিতে আমাদের প্রকৃত চাহিদাগুলিই বিকৃত হয়ে চলে। জীবন অতিবাহিত হয় বাজারের দেখানো জীবনবোধে, জীবনচর্চায়।

বাজারের তৈরী করা স্বপ্নগুলি বাপীদির মত মেয়েদের যেমন অলীক জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে চরম শূন্যতায় ভরা জীবনের দিকে ঠেলে দেয় তেমনি আমাদের সমাজ মানসিকতার কিছু বিকৃতি দায়ী থাকে যা শূন্যতা নিয়ে জন্মানো মানুষগুলিকে আলোর পরিসরে আসতে দেয় না। চরম শূন্যতাকে তাদের আবার আপন করে নিতে হয়। ফুলিয়ার বেশ্যা হয়ে ওঠার গল্পে এরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। দেহব্যবসায়ীর মেয়ে ফুলিয়ার পড়াশুনো করার শখ ছিল। যা হয়তো তাকে নতুন জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু পড়াশুনো হয়না মায়ের দেহব্যবসায়ী পরিচয়ের কারণে। তলিয়ে যেতে হয় সেই শূন্যতার মধ্যেই। লেখিকা ফুলিয়ার পরিচয়ে লিখেছেন—

"ফুলিয়া বলে একটা মেয়ে আসে, বয়স হয়ত হবে সতের। খুব কমই আসে। ওর মা কোঠায় বসত। এখন সে বুড়ি আর জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফুলিয়া ঘর চালায়। ওর ছোট ভাই মেয়েদের জন্য লোক ধরে আনে। দিদির জন্যও। চড়া ধারালো গলায় গান করা শুনলে বুঝতে পারি ফুলিয়া এসেছে। ওকে দেখতে খুব সুন্দর। খুব শখ ছিল পড়াশুনো শিখবে। ফোর অবধি পড়েছিল। নতুন ইস্কুলে ফাইভে ভর্তি হতে গেলে! হেডমাস্টারমশাই ওকে চিনে নিলেন। তিনি ওর মায়ের 'বাহক'। ভর্তি হওয়া হল না। ইস্কুলে ভাল বাচ্চারা পড়ে যে! ফুলিয়া তেরো বছরের হলে সেই মাস্টারমশাই ওর নথ খুলিয়েছিলেন।"[৫৯]

লেখিকা দেহ ব্যবসায়ীদের সেই চক্রের পরিচয় দিয়েছেন। যাদের শিকারে পরিণত হয় জেলে ধর্ষিতা হিসাবে আশ্রয় পাওয়া মেয়েরা। ধর্ষিতা মেয়েদের

বিচার পদ্ধতিতে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা হওয়ার মত ঘটনাগুলি, ধর্ষিতা মেয়েদের বাড়ির অভিভাবকদের নিস্পৃহ হয়ে থাকার মত ঘটনাগুলি যে অনেক ক্ষেত্রে এই সকল মেয়েদের দেহব্যবসায়ীদের চক্রে পৌঁছে দেয় লেখিকা বলে যান। প্রেসিডেন্সি জেলের ধর্ষিতা হিসাবে আশ্রয় পাওয়া নূরজাহানের কথা বলেন যার ভবিষ্যৎহীন পরিসর ঠেলে দেয় দেহব্যবসায়ীদের চক্রে। লিখেছেন–

"নূরজাহানকে আটকানোর চেষ্টা খানিকটা করেছিলাম। কিন্তু যার সামনে কিছু নেই– দেয়াল, পেছনে রাস্তা নেই, দেয়াল, তাকে যদি কোনও উপায় না দেখাতে পারি, আমি কী দিয়ে তাকে ফেরাব?

- তুই জানিস ওরা মেয়েদের কেন নিয়ে যায়? একেবারে ভেঙে পড়া গলায় বলে- দিদি, এখান থেকে যে লিলুয়ায় পাঠিয়ে দেবে।

- তোর বাড়ির লোক আসতেও তো পারে!

- বাড়ির লোক কি জানে হারালে জেলখানায় খুঁজতে হয়? যদি বা আসত কোর্ট কাছারি পুলিস দেখলে ভয়েই মরে যেত। আর এখন আমাকে কে ঘরে নেবে বলে দিদি?''[৬০]

সমাজের একেবারে প্রান্তিক অবস্থানের নূরজাহানদের মত মেয়েদের পরিচয় সমাজের আরেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিসরের থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়ে যায়। সমাজ বাস্তবতার বিভৎসতা ফুটে ওঠে। বিভৎসতা ফুটে ওঠে বেশ্যা বাপীদির এইরূপ হাহাকারেও - ''আমরা তো ফুটপাতে পড়েই মরি গো শেষকালটা।'' [৬১] তবে লেখিকা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন দেহপসারিণী এই সকল মেয়েদের জীবনের কেবল হতাশা নিরাশার পরিসরগুলিকে দেখতে পান না, দেখতে পান সমাজের নৃসংশতার শিকার এই সকল মেয়েদের দেখার ইচ্ছে। উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন। লেখিকা বেশ্যা ছাবরাদির কথা বলে যান যে, বেশ্যাবৃত্তি করেও মেয়ের উঁচু ক্লাসের খরচ যুগিয়ে চলে। লেখিকার কথায়–

"ছাবরাদি এসেছে। আবার এনেছে একগোছা লাল প্লাস্টিকের চুড়ি আর একশিশি কুমকুম। আর এনেছে ওর মেয়ের ছবি যে হোস্টেলে থেকে পড়ে। ছুটিতে যায় ছাবরাদির দাদার কাছে। ছাবরাদি আরও রোগা আরও শুকনো হয়ে গেছে। মেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছে, তার খরচ বাড়ছে। নিজের খরচ না কমালে, ছাবরা টাকা পাঠাবে কেমন করে? আর না খেয়ে খরচ কমালে মাংসচর্বি কমে গেলে, খদ্দের টাকা দিয়ে ওর মাংস ভাড়া করবে কেন? আমার মেয়ের ছবিটা হাতে নিয়ে দেখে অনেকক্ষণ। তারপর নেমে যায়।'' [৬২]

ছাবরাদির জীবনের গল্প পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জয়া মিত্র সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে নারীর লড়াইকেই বড় করে দেখিয়ে গেলেন। যা নারীর প্রতি সামাজিক লাঞ্ছনা, নৃশংসতার বেড়াজালে আঘাত করে।

'হন্যমান'-এ জয়া মিত্র একাধিক জীবনের ঘটনাবৃত্তির কথা স্মরণ করছেন। বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মাঝে স্মরণ করছেন বহরমপুর জেলে থাকাকালীন 'POW'-দের জেলে আসার ঘটনাকে।

"খবরের কাগজ সম্পূর্ণ বন্ধ। বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। তার উড়ো উড়ো গুজব শুনি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি সমস্ত পৃথিবী থেকে। আমি যে বেঁচে আছি একথা অন্যরা কেন, আমি নিজেই যেন বা ভুলে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। কোনও যোগাযোগ করতে পারছিনা কারুর সাথে। কী করব সে কথা চিন্তা করছি। এর মধ্যে দুটি নতুন ঘটনা। বাংলাদেশের যুদ্ধের 'POW' প্রায় দেড়শ মহিলাকে গোটা চল্লিশ কাচ্চা বাচ্চা সমেত, একদিন এই ওয়ার্ডে ভরে দেওয়া হল।'' [৬৩]
লেখিকার জেল জীবনের এই স্মৃতির প্রসঙ্গ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক ওঠা পরার কথা বলে যায়।

POW-দের বহরমপুর জেলে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিচয় দিতে লেখিকা এদের প্রতি সাধারণ জেলবাসীদের মনে জন্ম নেওয়া বিদ্বেষের কথা বলেছেন—

"এই মেয়েদের প্রতি সকলেরই একটা বিরক্তি, উদাসীনতা এমনি চাপা বিদ্বেষের ভাব। একথার উল্লেখ আমি এজন্য করলাম যে সাধারণ ভালো মানুষরাও সাম্প্রদায়িক বা যুদ্ধবাজ প্রচারে কতখানি প্রভাবিত হয় তা তখন অতি স্পষ্ট দেখেছি। কেউ জানে না বাংলাদেশে কী হয়েছে। এরাই বা কারা, শুধু বাইরে থেকে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের মুখে ছড়ানো গুজব আর উগ্র জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা সাধারণ বন্দীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।''[৬৪]

লেখিকার বহরমপুর জেলের সাধারণ জেলবাসীদের 'POW'-দের নিয়ে যে উপলব্ধি তাতে রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক সত্যেরই পরিচয় পাই। সাম্প্রদায়িকতার প্রচারেই তো বৃহত্তর ভারতবর্ষের চেহারা বদলে গেছে খণ্ডিত হয়েছে মানুষের হৃদ্যতার সম্পর্ক। কেবল ভারতবর্ষই নয় গোটা পৃথিবীই এমন অনেক ঘটনার সাক্ষ্য হয়েছে যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধবাজ, উগ্রজাতীয়তাবাদ এর মত মনবৃত্তিগুলির প্রচারে মানুষের মানবিক বোধগুলি নিহত হয়ে পাশবিক ঘটনাবৃত্তির বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে।

বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মাঝে লেখিকা দেশের এমার্জেন্সির সময়ে কারাপ্রাচীরের ভেতর কিরূপ খাদ্য সংকটের সূচনা হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। এমার্জেন্সির সময় প্রেসিডেন্সি জেলে সাধারণ বন্দিদের পরিবেশিত খাবারের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন–

" কাগজ বলছে বাইরে এমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে। ... সারা দেশে নাকি কড়া র‍্যাশনিং চালু হয়েছে। জেলে খাবারের পরিমাণ কমতে কমতে ঠিক একহাতা ভাতে এসে ঠেকেছে। মায়েদের সঙ্গে যে বাচ্চারা আসে তাদের ভাত দেওয়া হচ্ছে না। ... একদিন ফাইলে এসে জেলার ঘোষণা করে গেলেন, ভাত-রুটির ঘাটতি পূরণ করতে, প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন দু'শ গ্রাম করে আলুসেদ্ধ বরাদ্দ হয়েছে। ... বিকেলের রুটি এত ময়লা আর কালো যে বাধ্য হচ্ছি একথালা জলে

রুটিগুলোকে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতে। .... প্রায় দু' মাস হয়ে গেল, তরকারি হিসেবে আসছে বালতি ভরা জল আর নুন দিয়ে সেদ্ধ করা ট্যাঁড়সের কালো পিছল ঝোল।''[৬৫]

২৫শে জুন, ১৯৭৬ এমার্জেন্সি ঘোষিত হওয়ার পরবর্তীকালে সমগ্র দেশেই প্রবল খাদ্য সংকটের সূচনা হয়েছিল। কারাপ্রাচীরের ভেতর খাদ্যসংকটের এই চিত্র থেকে আমরা দেশের পুরো চিত্রটাই যেন কল্পনা করতে পারি। এই ভাবেই একাধিক ঘটনাবৃত্তে মানুষের কথা বলতে বলতে লেখিকা এক বৃহত্তর সময় সমাজের পরিচয় দিয়ে গেছেন *'হন্যমান'* বইটিতে। কোথাও বলেছেন– *"ভালোই কাটে দিন। কেবল কক্ষনো মনে করতে চাই না বাড়িতে রেখে আসা, আমার পেটমোটা নীল চোখ দেড় বছরের মেয়েটাকে আর ভাঙ্গা শিরদাঁড়ার লক্ষীছাড়া ব্যথাকে।''*[৬৬] একজন মা হিসেবে ঘরে ফেলে আসা মেয়ের জন্য লেখিকার এইরূপ ব্যকুলতা *'হন্যমান'* বইটিকে আলাদা মাত্রা দিয়ে যায়। জেলের প্রাচীর লেখিকার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু লেখিকা জীবনের প্রতি প্রবল রোমান্টিকতা ধরে রাখতে চেষ্টা করেন। জেলের আবদ্ধতার মাঝে বাইরের পৃথিবী– তাঁকে বারে বারেই আকর্ষণ করে। মেদিনীপুর জেল থেকে বহরমপুর জেলে ট্রান্সফারের সময় লেখিকার চোখে ধরা পড়ে বাইরের পৃথিবীর দৃশ্য। লিখেছেন– *"শেষ আলোয় দেখি ছোট্ট ব্রিজের নীচে ছোট্ট নদী। তাতে জাল টেনে তুলছে একজন, পাশে তার বৌ, হাতে ঝুড়ি। কালো ছেলে, ন্যাড়া মাথা, কোমরে ঘুনসি বাঁধা, কাদা ঘাঁটছে মনের সুখে। ছবিটা স্পষ্ট এখনও, আলোছায়ার ফ্রেম শুদ্ধ।''*[৬৭] এর বাইরে আরও কয়েকটি জায়গায় এইভাবে বাইরের রঙিন পৃথিবীর প্রতি লেখিকার আকর্ষণ চোখে পড়ে। নিজের জেল জীবন নিয়ে লেখিকাকে রসিকতাও করতে দেখা যায়। বহরমপুর জেলে অন্ধকারে কাটাবার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লেখেন– *"অন্ধকারে মশা মারতে মারতে বুঝতে পারি অর্জুন-দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অদৃশ্য লক্ষ্য নির্ভুল ভেদ করেছিল কী করে। বনে-জঙ্গলে*

থাকতে হয়েছিল যে!''[৬৮]

কিংবা কখনো জেল জীবনে নিজের 'লুডো খেলা'র অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন– *"দু'হাতে লুডো খেলি সারাদিন। ডান হাতে লাল-হলুদ, বাঁ হাতে নীল-সবুজ। প্রায় দু-মাস একটানা খেলেছিলাম। জীবনে আর লুডো বোর্ড ছোঁব না কক্ষনো।''*[৬৯] জেলে কাটানোর সময়ে লেখিকার ব্যক্তি জীবনের এইরূপ প্রসঙ্গগুলির সংযোজনে *'হন্যমান'* বইটি অনেক বেশী আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। তবে *'হন্যমান'* বইটিতে লেখিকার ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গ কম। আশপাশে থাকা সাধারণ জেলবাসীদের জীবনের কথাই জয়া মিত্র বেশী বলেছেন। মেয়েদের আত্মজীবনীর এক সাধারণ প্রবণতা এই যে সেখানে পারিপার্শ্বিকতার পরিচয় অধিক থাকে। দৈনন্দিন জীবনচর্যার কথা, বাড়িতে পালনীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা, আত্মীয় পরিজনের কথা মেয়েরা যে পরিমানে তাঁদের আত্মকথায় লেখেন পুরুষের আত্মকথায় তার অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়। সেখানে অনেক বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা গুরুত্ব পায়। ব্যক্তি জীবনের সাফল্য ব্যর্থতার আখ্যান পুরুষের আত্মকথায় গুরুত্ব পাবার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। সে জায়গায় একজন অখ্যাত নারীও আত্মকথা রচনা করেন, ব্যক্তি জীবনে তাঁর সেরকম সাফল্য ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও। সে দিক থেকে বলা যায় জয়া মিত্র মেয়েদের আত্মকথা রচনার স্বাভাবিক রীতিকে অবলম্বন করেছেন। তবে পাঠকের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে আমারও মনে হয় লেখিকা জীবনের বাকি পর্বগুলির কথা লিখলে আমরা আরও বৃহত্তর সময় ও সমাজের পরিচয় পেতাম। এই জায়গায় দেখার বিষয় জয়া মিত্র তাঁর ৩৫ উর্দ্ধ বয়সেই *'হন্যমান'* বইটি রচনা করেছেন। আর এই বয়সে এসে শৈশব থেকে গোটা জীবনের ইতিহাস রচনার তুলনায় লেখিকাকে প্রেরণা দিয়েছে জীবনের কঠিনতম পর্বটির কথা লিখতে। যেখানে লেখিকা ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস রচনায় গুরুত্ব না দিয়ে একজন সমাজ হিতৈষি লেখকের ভূমিকাই অধিক গ্রহণ করলেন। আর এর মধ্য দিয়েই *'হন্যমান'* বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে বলা যায়।

তথ্যসূত্র

১। জয়া মিত্র, হন্যমান, দে'জ, কলকাতা, মে ২০০৯, পৃ: লেখিকার কথা অংশ।

২। জয়া মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩। জয়া মিত্র, 'চলতে চলতে', 'সেই দশক', সম্পা: পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ১৪৪-১৪৫।

৪। জয়া মিত্র, 'চলতে চলতে', প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৫।

৫। জয়া মিত্র, 'হন্যমান', দে'জ, কলকাতা, মে ২০০৯, পৃ: ৯।

৬। জয়া মিত্র, 'হন্যমান', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১ ও ৬২।

৭। ঐ, পৃ: ৬২।

৮। 'তিমির মায়ের চোখে', অধুনা জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭ মার্চ ১৯৯৭, পৃ: ৩২।

৯। জয়া মিত্র, 'হন্যমান', প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৫।

১০। ঐ, পৃ: ১০০।

১১। ঐ, পৃ: ১১।

১২। ঐ, পৃ: ৯৭-৯৮।

১৩। জয়া মিত্র, 'চলতে চলতে', প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬২।

১৪। মায়া চট্টোপাধ্যায়, 'সেই দশকের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ', 'সেই দশক, সম্পা: পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ৯২।

১৫। জয়া মিত্র, 'হন্যমান', প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭।

১৬। জয়া মিত্র, হন্যমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪।

১৭। ঐ, পৃ: ৩৭।

১৮। ঐ, পৃ: ২৬।

১৯। ঐ, পৃ: ১৬।

২০। ঐ, পৃ: ১৬।

২১। ঐ, পৃ: ১৭।

২২। ঐ, পৃ: ১৩।

২৩। ঐ, পৃ: ১৯—২০।

২৪। দূর্বা দেব, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ২০।

২৫। জয়া মিত্র, হন্যমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।

২৬। ঐ, পৃ: ২১।

২৭। ঐ, পৃ: ৫৭।

২৮। ঐ, পৃ: ৫৭-৫৮।

২৯। ঐ, পৃ: ১০২।

৩০। ঐ, পৃ: ২১-২২।

৩১। ঐ, পৃ: ২৯।

৩২। ঐ, পৃ: ৩০।

৩৩। ঐ, পৃ: ৩০।

৩৪। ঐ, পৃ: ৩০।

৩৫। ঐ, পৃ: ৩১।

৩৬। ঐ, পৃ: ৩২।

৩৭। ঐ, পৃ: ৩৭।

৩৮। ঐ, পৃ: ৫৭।

৩৯। জয়া মিত্র, হন্যমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।

৪০। ঐ, পৃ: ১৪৪।

৪১। ঐ, পৃ: ৪৪।

৪২। ঐ, পৃ: ১৭।

৪৩। ঐ, পৃ: ৮৫-৮৭।

৪৪। ঐ, পৃ: ৫০।

৪৫। ঐ, পৃ: ৬২।

৪৬। ঐ, পৃ: ৬২।

৪৭। ঐ, পৃ: ১২৫।

৪৮। ঐ, পৃ: ১২৬।

৪৯। ঐ, পৃ: ৪০।

৫০। ঐ, পৃ: ১২৭।

৫১। ঐ, পৃ: ১০৮।

৫২। ঐ, পৃ: ৪১।

৫৩। ঐ, পৃ: ১১২।

৫৪। ঐ, পৃ: ১২৮।

৫৫। ঐ, পৃ: ১২৮।

৫৬। ঐ, পৃ: ১১৭।

৫৭। ঐ, পৃ: ১১৮।

৫৮। ঐ, পৃ: ১১৯।

৫৯। ঐ, পৃ: ১২৯।

৬০। ঐ, পৃ: ১২২।

৬১। ঐ, পৃ: ১২০।

৬২। ঐ, পৃ: ১৩৬।

৬৩। জয়া মিত্র, হন্যমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৬৪। ঐ, পৃ: ৬৬।

৬৫। ঐ, পৃ: ১০৫-১০৬।

৬৬। ঐ, পৃ: ১৯।

৬৭। ঐ, পৃ: ২৩।

৬৮। ঐ, পৃ: ৩১।

৬৯। ঐ, পৃ: ৩১।